

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন : কোম্পানি আমল



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ নিজেদের ব্যবসা আর ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার কৌশল জুলিয়ান রবিনস-এর চেয়ে সম্ভবত আর কেউ দেখাতে পারেনি। তিনি যখনই লক্ষ্য করলেন নিজেদের ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার পথে তখনই তার কোম্পানির ওপর নির্ভর করে তোলেন দেশটির রাজাদের। তার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের কাছে প্রশংসিত ও গ্রহণীয় হয়ে পড়েছিল।

◀ **শিখনফল-১**

- ক. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তা কে? ২
খ. ওয়ারেন হেস্টিংসের বাণিজ্য সংস্কারের সৎক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের যে ঐতিহাসিক ব্যক্তির পররাষ্ট্রনীতির চিত্র ফুটে উঠেছে তা নিবূপন করো। ৩
ঘ. এই ধরনের একজন ইংরেজ শাসকের অযোধ্যা নীতি আজও ভারতবর্ষের ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছে— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. লর্ড কর্নওয়ালিস ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তা।

খ. ওয়ারেন হেস্টিংস বাণিজ্যনীতিতে ব্যাপক সংস্কার করেন।

হেস্টিংস কোম্পানির কর্মচারীদের বিনা শুল্ক ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। দস্তক প্রথা আইন লোপ পায়। মাল চলাচলের সুবিধার জন্য কলকাতা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনা ছাড়া তিনি সমস্ত শুল্ক চেকি বন্ধ করে দেন। এ ছাড়া তিনি কাপড় তৈরির জন্য তাঁতিদের ওপর জলুম নিষিদ্ধ করেন। পাশাপাশি ভুটান ও তিব্বতের সাথে বাণিজ্য শুরু করেন।

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের ঐতিহাসিক ইংরেজ শাসনের সুসংহত-করণে যার অবদান অনস্বীকার্য সেই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পররাষ্ট্রনীতির মিল রয়েছে।

হেস্টিংস গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে দেখলেন যে, কোম্পানি ইতোমধ্যে বাংলার বণিক সংঘ থেকে শাসক-রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যসমূহ এবং রাজনৈতিক শক্তির প্রতি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাই তিনি গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে সর্বপ্রথমেই পররাষ্ট্র বা সীমান্তনীতি বিষয়ে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন।

হেস্টিংস লক্ষ্য করেন যে, কোম্পানি ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পড়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজদের অধিকার স্থায়ী করতে হলে দেশীয় রাজাদের যথাসম্ভব ইংরেজ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলা প্রয়োজন। এ জন্য তিনি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সূচনা করেন যা তার পরবর্তী অধিকারীগণ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন।

ঘ. মূলত ওয়ারেন হেস্টিংস-এর অযোধ্যা নীতি ভারতবর্ষের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে।

এক চরম দুর্যোগময় মুহূর্তে হেস্টিংস বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। এদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণকে বাঁচাতে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হতে দশ লক্ষ পাউন্ড ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। যার দ্রুত তাঁকে ঋণ পরিশোধ ও আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যয়-সংকোচন নীতি গ্রহণ করে গর্হিত ও নীতি বিরুদ্ধ কাজ শুরু করতে হয়।

এ প্রেক্ষাপটে হেস্টিংস ইংরেজদের শত্রু মারাঠাদের আশ্রয়ে বাস করার অজুহাতে সম্রাট শাহ আলমকে দেয় বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা বন্ধ করে দেন এবং সম্রাটের নিকট হতে ‘বারানসির সন্ধি’ দ্বারা এলাহাবাদ ও কারা জেলা দুটি অযোধ্যার নবাবকে ৫০ লাখ টাকার বিনিময়ে প্রদান করেন। এমনকি তাঁর অর্থ উপার্জনের লালসা হতে বারানসির রাজা চৈৎ সিংহ ও অযোধ্যার বেগমগণও রেহাই পাননি।

এভাবে হেস্টিংস অযোধ্যার শক্তি বৃদ্ধি করে একে মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে একটি শক্তিশালী মধ্যবর্তী রাজ্য (Buffer state) হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। আর এটাই ছিল তাঁর অযোধ্যা নীতির মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন ▶ ২ রাহাত সাহেব একজন সাংবাদিক। তিনি গত সপ্তাহে ভারতের কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে লিখতে গিয়ে উপমহাদেশের একটি সংস্কারের কিছু কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ঔপনিবেশিক আমলে দুর্নীতি দমনের জন্য রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয় এবং একটি রাজস্ব বোর্ড গঠন করা হয়। তখন রাজকোষাগারের শূন্যতা পূরণের জন্য হেস্টিংস পাঁচ বছরমেয়াদি সর্বোচ্চ মূল্যে জমিদারি ইজারা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। ইতিহাসে এটাই পাঁচসালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এ প্রসঙ্গে আমাদের ব্যাংকগুলোর অধিক মূল্যে আমানত সংগ্রহ করাকে পুরোনো ইতিহাস বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অর্থের বিনিময়ে সৈন্য ভাড়া দেওয়াও এদেশে তখন থেকেই চালু হয়।

◀ **শিখনফল-১**

- ক. মহীশূরের হায়দার আলী কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? ১
খ. লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রাহাত সাহেবের তথ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের যে সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর অর্থের বিনিময়ে সৈন্য ভাড়ার কথাটির সাথে রোহিলা যুদ্ধের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. মহীশূরের হায়দার আলী ১৭২১ খ্রিষ্টাব্দে গুলবর্গা রাজ্যের বুদিশোট (Budikote) নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

খ. ব্রিটিশ শক্তির ওপর নির্ভরশীল দেশীয় রাজ্যগুলো কৃষ্ণগত করার জন্য যে নতুন নীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল তাই স্বত্ববিলোপ নীতি। এ নীতির মূলকথা হলো- ব্রিটিশদের অধীন কিংবা ব্রিটিশ শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে

মৃত্যুবরণ করলে সে রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। কোনো পালিত পুত্রকে এসব রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না।

লর্ড ডালহৌসি ঘোষণা করছিলেন যে, কেবল আশ্রিত বা নির্ভরশীল (Protected) বা (Dependent States) হিন্দু রাজ্যগুলোর ওপরই স্বত্ববিলোপ নীতি প্রযুক্ত হবে।

গ উদ্দীপকের রাহাত সাহেবের তথ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়।

ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রবার্ট ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটান। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে অত্যাচারের অভিযোগে হেস্টিংস বাংলা ও বিহারের ডেপুটি নবাবের পদ দুটি বাতিল করে রাজস্ব ও দেওয়ানিসংক্রান্ত দায়িত্ব কোম্পানির শাসনাবধীনে আনয়ন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস ইউরোপীয় কালেকটর নিযুক্ত করে তাদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত করেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতি দমন এবং এর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও পরিচালনার জন্যে কলকাতায় একটি রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। রাজস্ব বিভাগে শৃঙ্খলা প্রবর্তনের জন্যে হেস্টিংস রাজকোষ মুর্শিদাবাদ থেকে নতুন রাজধানী কলকাতায় স্থানান্তর করেন। রাজকোষাগারের শৃণ্যতা পূরণের জন্যে হেস্টিংস পাঁচ বছর মেয়াদি সর্বোচ্চ মূল্যে জমিদারি ইজারা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করে কোম্পানির আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। ইতিহাসে এটাই পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত।

ঘ আমি মনে করি, অর্থের বিনিময়ে সৈন্য ভাড়ার কথাটির সাথে রোহিলা যুদ্ধের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

রোহিলা যুদ্ধ ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এ রাজ্যটির সর্দার হাফিজ রহমত খাঁ মারাঠা আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে অময়ান্দার নবাবের সাথে এই মর্মে চুক্তি করেন যে, মারাঠারা রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করলে নবাব তাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে নবাবকে ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠারা রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করলে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা ইংরেজ কোম্পানির সাহায্যপুষ্ট হয়ে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এ খবর পেয়ে মারাঠারা ভীত হয়ে বিনাযুদ্ধে ফিরে যায়। নবাব চুক্তি অনুযায়ী ৪০ লক্ষ টাকা দাবি করলে আফগান সরদার হাফিজ রহমত খাঁ তা দিতে অস্বীকার করেন। অময়ান্দার নবাব হেস্টিংসের শরণাপন্ন হন। তিনি যুদ্ধের ব্যয় ছাড়াও ৪০ লক্ষ টাকা প্রদানের বিনিময়ে রোহিলাখণ্ড দখলে ইংরেজ সহায়তা কামনা করলে হেস্টিংস সানন্দে এ প্রস্তাবে রাজি হন।

রোহিলাগণ যখন মারাঠা কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং চুক্তি মোতাবেক অযোধ্যার নবাব রোহিলাদের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু এই সময় মারাঠাদের রাজধানীতে উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব সংঘটিত হলে তারা হঠাৎ করে সেনা ছাউনি উঠিয়ে স্বদেশে চলে যায়। একরূপ বিনাযুদ্ধে রোহিলাগণ মারাঠা আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। চুক্তি মোতাবেক অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলা রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমতের নিকট ৪০ লক্ষ টাকা দাবি করলে তিনি বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেন। এভাবে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে সুজা-উদ-দৌলার মিরনপুর কাটরার যুদ্ধে রোহিলাদের পরাজিত করে রোহিলাখণ্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত করেন। যুদ্ধে রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমত নিহত হন। হেস্টিংস অর্থের বিনিময়ে ব্রিটিশ সৈন্য ভাড়া দেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রোহিলা যুদ্ধের সাথে উদ্দীপকের অর্থের বিনিময়ে সৈন্য ভাড়ার কথাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রশ্ন ৩ ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে ইউসুফ সাহেব ভারতে ভ্রমণ করার সময় তাদের একটি রাজ্যের পাবলিক লাইব্রেরিতে একটি বই পড়ে জানতে পারেন, একজন নবাব টিপু সাহেবের চরম শত্রু। রাজ্য সংক্রান্ত বিবাদে বিদেশি এক ব্যবসায়ীগোষ্ঠী নবাবকে সমর্থন করলে টিপু সাহেব ব্যবসায়ীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এরপর টিপু সাহেব ব্যবসায়ীদের শক্তির প্রস্তাব দিলে তারা প্রত্যাখ্যান করেন। এক সময় টিপু সাহেব নিজের নিরাপত্তার জন্য অন্য এক প্রভাবশালী লতিফের সাথে প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এক সময় লতিফ ও টিপুর যৌথ বাহিনী বিদেশি শাসকশ্রেণিকে আক্রমণ করলে একটি যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

◀ পিছদফল-২

ক. মিরন কাটরার যুদ্ধে রোহিলা সর্দার কে ছিল?

খ. লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদ নীতির উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা কর।

গ. ইউসুফ সাহেবের পড়া বইটিতে পাঠ্যবইয়ের যে যুদ্ধের ইজিত পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা দাও।

ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল — মতামত প্রদান করে যথার্থতা নিরূপণ কর।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিরন কাটরার যুদ্ধে রোহিলা সর্দার ছিলেন হাফিজ রহমত খান।

খ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং শাসনের প্রসার ঘটাতে লর্ড ডালহৌসি সাম্রাজ্যবাদ নীতি প্রণয়ন করেন।

ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত যে সকল সাম্রাজ্যবাদী শাসক প্রেরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে লর্ড ডালহৌসি ছিলেন চরম প্রকৃতির। লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদ নীতির উদ্দেশ্য হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শাসনের প্রসার, ইংরেজ সাম্রাজ্যের সংহতি স্থাপন ও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার সৃষ্টি। তিনি তার সাম্রাজ্যবাদ নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে সমর্থ ছিলেন।

গ উদ্দীপকের ইউসুফ সাহেবের পড়া বইটিতে পাঠ্যবইয়ের ১ম ইজা-মহীশূর যুদ্ধের ইজিত পাওয়া যায়।

হায়দার আলীর উত্থানে ইংরেজরা তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এরপর পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, সংশয় ও ছোটখাটো ঘটনার জের ধরে ১ম ইজা-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। হায়দার আলীর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ফরাসি শক্তির সাথে তার আঁতাত মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল।

এ যুদ্ধে কোম্পানি ও মারাঠারা নিজামের মিত্ররূপে কাজ করে। ঐতিহাসিক ড. হলওয়েলের মতে, 'ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠাদের এ জোট স্থায়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, তাদের স্বার্থ ছিল পরস্পরবিরোধী।' ফলে শীঘ্রই নিজাম ও মারাঠা হায়দারের কূটনীতি ও অর্থের প্রলোভনে এ জোট ত্যাগ করে। ফলে ইংরেজরা মিত্রহীন হয়ে পড়ে। ইংরেজরা পুনরায় নিজামকে নিজ আয়ত্তে এনে ব্যাজালোর অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু হায়দার আলীর অশ্বারোহী বাহিনী ইংরেজ সেনার পাশ কাটিয়ে অতর্কিতভাবে অরক্ষিত মাদ্রাজ শহরের সামনে হাজির হলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মনোবল ভেঙে যায়। তারা হায়দার আলীর সাথে এক সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। এ সন্ধির মাধ্যমে উভয় পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফেরত দিয়ে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনে। কোম্পানি ও মারাঠাদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় মহীশূর যুদ্ধ হয়।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যাটি দ্বারা দ্বিতীয় ইজা-মহীশূর যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। আর এ সমস্যা দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল— আমি এ কথার সাথে পুরোপুরি একমত।

১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করলে হায়দার আলী সন্ধির শর্তানুসারে ইংরেজদের নিকট সামরিক সাহায্য চায়। কিন্তু ইংরেজরা তাকে সাহায্য না করে চুপ করে থাকে। স্বভাবতই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে অধিকতর বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কূতসংকল্প হন।

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসি অধিকৃত মাহে বন্দরটি ইংরেজরা দখল করে নিলে হায়দার আলী ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ তিনি কর্নাটকে প্রবেশ করে ইংরেজ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে আর্কট দখল করেন। স্যার আলফ্রেড লয়ালের ভাষায়, ইংরেজদের ভাগ্য বিড়ম্বনা তখন চরমে পৌঁছেছিল। এ শোচনীয় অবস্থায় হেস্টিংস ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা করতে সচেষ্ট হন।

অবশেষে ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে হায়দার আলী হেস্টিংস কর্তৃক প্রেরিত সেনাধ্যক্ষ আয়ারকুটের হাতে পেটোনোভার যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে হায়দার আলীর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঞ্জোরের নিকট টিপু সুলতানের হাতে ব্রিটিশ সেনাপতি কর্নেল ব্রেইথওয়েট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে ব্যাঙ্গালোরে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে উভয়পক্ষই পরস্পরের সন্ধিকৃত স্থান প্রত্যর্পণ করতে সীকৃত হন। ব্যাঙ্গালোরের সন্ধি মনঃপূত না হলেও হেস্টিংস অনুমোদন করতে বাধ্য হন। পরিশেষে বলা যায় যে, দ্বিতীয় মহীশূর সমস্যাটি ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘসময় স্থায়ী ছিল।

প্রশ্ন ▶ ৪ জনাব আকমল তার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন। এখানে এসে দেখতে পান ইংরেজি মাধ্যমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারে। একজন শিক্ষকের কাছে তিনি জানতে পারলেন ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার এবং পাশ্চাত্যের সাথে এই শিক্ষার সমতা বিধান ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের একটি সনদ বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে। একজন শিক্ষানুরাগী লর্ড এখানকার প্রচলিত শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তার সময়েই উল্লিখিত সনদটি আরও ২০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করে অনেক নিয়মনিতির পরিবর্তন সাধন করা হয়।

◀ পিখনফল-৪

- | | |
|--|---|
| ক. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক কে ছিলেন? | ১ |
| খ. সতীদাহ প্রথা কী? ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. শিক্ষকের ইংরেজি ভাষা সম্পর্কিত তথ্যটিতে পাঠ্যপুস্তকের যে সংস্কারের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে তা বর্ণনা করো। | ৩ |
| ঘ. ২০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা আইনটি হলো ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের পরিবর্তনের আইন— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। | ৪ |

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক (Lord William Bentinck) ছিলেন ভারত উপমহাদেশে নিযুক্ত একজন শান্তিপ্ৰিয়, সংস্কারবাদী এবং উদারনৈতিক ব্রিটিশগভর্নর জেনারেল।

খ বহু প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি অমানবিক প্রথা হলো সতীদাহ প্রথা।

এ প্রথা অনুযায়ী স্বামী মারা গেলে তার চিতায় জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হতো। সহমরণ (মৃত স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যুবরণ করা) এবং অনুমরণ (বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবাকে একাকী চিতায় পুড়িয়ে মারা) এই দুটি উপায়ে তা কার্যকর করা হতো। রাজা রামমোহন

রায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের সহযোগিতায় এ অমানবিক প্রথা উচ্ছেদ করেন।

গ শিক্ষকের ইংরেজি ভাষা সম্পর্কিত তথ্যটিতে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার লর্ড বেন্টিনকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ উপমহাদেশ থেকে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষার প্রভাব খর্ব করে পাশ্চাত্য সমাজের ইংরেজি ভাষার প্রচলনে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। ভারতবাসীর কল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন না করলেও কার্যত তার উদ্যোগে ভারতীয়দের কল্যাণই হয়েছিল, যার প্রতিফলন উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন লর্ড বেন্টিনকের হাত ধরেই হয়েছিল। তিনি এদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ-ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার কল্যাণে ব্যবহার না করে ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন। দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ফারসি বাতিল করে ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বেশ কিছু স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যার সুবিধা এখনো ভারতবাসী ভোগ করছেন।

ঘ ২০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা আইন অর্থাৎ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের শাসনামলে প্রণীত ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনটি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের পরিবর্তনের আইন- উক্তিটি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য ছিল। এই অর্থ কেবল সংস্কৃত, ফারসি প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় হতো। ইতঃপূর্বে ফারসি ছিল ভারতের দাপ্তরিক ভাষা। বেন্টিনকের পূর্বে কোন গভর্নর জেনারেলই দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ফারসিকে বাতিল কমরননি। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বেন্টিনক এই অর্থ ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে বলে ঘোষণা দিলে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তদানীন্তন ব্রিটিশসেক্রেটারি এইচ.টি প্রিন্সেপ (Henry Thoby Prinsep) এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলসন প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ ব্যয় করার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। অপর দিকে মেকলে (Thomas Babington Macaulay) এবং রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। লর্ড বেন্টিনক সকল বাধা উপেক্ষা করে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ৭ মার্চ ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ ব্যয় হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, ১৮৩৩ সালের চার্টার ছিল শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

প্রশ্ন ▶ ৫ রাজা সুশীল কুমার রায় তার রাজ্যের পার্শ্ববর্তী দুর্বল ও পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত রাজ্যগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে সুযোগমত দখল করার লক্ষ্যে ঘোষণা করলেন যে, শর্তসাপেক্ষে যেকোনো রাজ্য তার বন্ধুত্ব লাভ করতে পারে। শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোন রাজ্যের সাথে সন্ধি বা যুদ্ধ করা যাবে না। দেশে তার একদল সৈন্য পালন করতে হবে। অন্যদেশের নাগরিকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এ শর্তগুলো মেনে নিলে তিনি বন্ধুত্ব গ্রহণকারী দেশের নিরাপত্তা বিধান করবেন। স্বাধীনতা প্রিয় কিছু রাজা এ অপমানকর বন্ধুত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। ফলে তাদের সাথে সুশীল রায়ের সংঘর্ষ হয়।

◀ পিখনফল-৪

- ক. কার ফাঁসির জন্য লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে অভিযুক্ত করা হয়? ১
- খ. পলাশীর যুদ্ধের চেয়ে বক্সারের যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের রাজার ঘোষিত নীতির সাথে ইংরেজদের কোন নীতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত নীতির ফলাফল কী হয়েছিল? ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে অভিযুক্ত করা হয়।

খ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমেই উপমহাদেশে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পলাশীর যুদ্ধে কেবল বাংলার নবাব পরাজিত হন কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব এবং মুঘল সম্রাট সম্মিলিতভাবে পরাজিত হন। এর ফলে রবার্ট ক্লাইভ আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির সম্রাট কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেউয়ানি লাভ করে।

গ উদ্দীপকের রাজার ঘোষিত নীতির সাথে লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে যে কৌশল সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি প্রয়োগ করেন তা 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' (Subsidiary Alliance) হিসেবে পরিচিত। ওয়েলেসলি অনুসৃত এ নীতির শর্তানুযায়ী যে সকল দেশীয় রাজ্যের রাজা এ নীতিতে আবদ্ধ হবেন তারা ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে কোন রাজ্যের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা বা আলাপ-আলোচনা করতে পারবে না। চুক্তিভুক্ত শক্তিশালী রাজ্যগুলো তাদের রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখবেন এবং বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যের একাংশ কোম্পানিকে অর্পণ করবে। তারা নিজস্ব সেনাবাহিনী রাখতে পারবে তবে তা হবে একান্ত ইংরেজ সেনাপতির অধীন। উপর্যুক্ত শর্তাদি পালনের বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ রাজ্যগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। উদ্দীপকে রাজা সুশীল কুমার রায় কর্তৃক তার রাজ্যে অনুসৃত ইংরেজদের কর্তৃক অনুসৃত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির অনুরূপ। যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

ঘ উক্ত নীতি অর্থাৎ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ফলাফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

প্রথমত, অযোধ্যার সাথে ওয়ারেন হেস্টিংস ও জন শোরের সময়কাল হতেই ইংরেজ কোম্পানির মিত্রতা চুক্তি ছিল। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ওয়েলেসলি এক নতুন চুক্তি করে পূর্বের মতো বাৎসরিক অর্থগ্রহণের পরিবর্তে রোহিলাখন্ড, গোরক্ষপুর এবং দোয়ার অঞ্চল নিয়ে আসেন। চুক্তিমতো নবাব তার সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে ইংরেজ বাহিনীর নিরাপত্তা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, হায়দারাবাদের নিজামও ওয়েলেসলির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে নিজের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেন। তিনি ইংরেজ সেনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে তুজাভদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ রাজ্যংশ ইংরেজ কোম্পানিকে ছেড়ে দেন। এভাবে শক্তিশালী নিজামের রাজ্য ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির অধীনে আসে।

তৃতীয়ত, নানা ফড়নবীশের মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মারাঠাগণ হীনবল হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দেয়। যশোবন্ত সিং হোলকার পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর রাজ্য আক্রমণ করে। যশোবন্ত সিং হোলকারের নিকট পূর্ণার সন্নিকটে শোচনীয়ভাবে

পরাজিত হলে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পালিয়ে ব্রিটিশদের আশ্রয় গ্রহণ করে ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে অধীনতামূলক মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন।

চতুর্থত, ওয়েলেসলি মহীশূর রাজ্যের টিপু সুলতানকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণের প্রস্তাব দেন। টিপু সুলতান প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ওয়েলেসলি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে টিপু সুলতান মৃত্যুবরণ করেন এবং মহীশূর রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

এছাড়া ছোট ছোট রাজ্য (কর্নাটক, তাজৌর, সুরাট) রাজ্য সমূহকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণে বাধ্য করেন এবং এভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।

সুতরাং বলা যায়, অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা অনেক দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রাণকেন্দ্র। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন এখানে প্রায়ই তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ে সমাবেশ করে থাকে। গত ১৩ মার্চ একটি ছাত্র সংগঠনের সভাপতি তার বক্তৃতায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, ওবামা একজন ঘোর-সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তার অধীনতামূলক মিত্রতা এবং অগ্রসরনীতি কোনো পৃথক নীতি নয়। তিনি একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এই দুটি নীতির প্রয়োগ করে থাকেন। ওবামা বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতি অধীনতামূলক মিত্রতানীতি প্রয়োগ করে আমেরিকার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি এবং আমেরিকা মহাদেশের দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোসহ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি সম্প্রসারণনীতি গ্রহণ করে তার দেশের প্রাধান্য স্থাপন করতে অগ্রসর হন। তিনি বিশ্বকে আমেরিকার শাসনাধীন করতে সারাবিশ্বে কাজ করে যাচ্ছেন।

- ক. কত খ্রিষ্টাব্দে সিকিম রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়? ১
- খ. ওয়ারেন হেস্টিংসের সর্বাঙ্গীকৃত বর্ণনা দাও। ২
- গ. বারাক ওবামার সাথে লর্ড ওয়েলেসলির নীতির মিলগুলো বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে করো বারাক ওবামার মতো লর্ড ওয়েলেসলিও বিশ্ব মোড়লে উন্নীত হওয়ার জন্য কাজ করতেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সিকিম রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

খ ভারতবর্ষের ইংরেজ শক্তি সুসংহতকরণে হেস্টিংসের অবদান অনস্বীকার্য।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় কোম্পানির একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ফরাসি ও বাংলা ভাষা ভালো করে জানতেন। পাশাপাশি উর্দু ও আরবিতেও ভালো ছিলেন। নিজ দক্ষতাগুণে কাশিম বাজারের রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হন। ১৭৭২-১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার গভর্নর এবং ১৭৭৪-১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গভর্নর জেনারেল হিসেবে শাসন করেন।

গ বারাক ওবামার সাথে লর্ড ওয়েলেসলির নীতির উদ্দেশ্যগত মিল পরিলক্ষিত হয়।

ওয়েলেসলি তার সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়ে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগ করে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করেন। সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেসলি সুরাটের প্রতি তার লোলুপ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেন। সুরাটের নবাব অপূত্রক অবস্থায় মারা গেলে ওয়েলেসলি তার ভ্রাতার দাবি অস্বীকার করে সুরাট দখল করেন।

ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী নীতির ছোবল থেকে অযোধ্যাও রক্ষা পায়নি। অথচ অযোধ্যা শুরু থেকেই ইংরেজদের মিত্র রাজ্য এবং মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী রাজ্য হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ওয়েলেসলি কুশাসনের অজহাতে এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র জামান শাহের ভারত আক্রমণের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তা দৃঢ় করার জন্য অযোধ্যার নবাবকে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী গোরক্ষপুর, রোহিলাখণ্ড এবং দোয়াবের একাংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হয়। ওয়েলেসলির অযোধ্যা নীতি ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বিরূপভাবে সমালোচিত হয়েছে।

ঘ আমি মনে করি, বারাক ওবামার মতো লর্ড ওয়েলেসলিও বিশ্ব মোড়লে উন্নীত হওয়ার জন্যে কাজ করতেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে লর্ড ওয়েলেসলি কোম্পানির শাসনভার গ্রহণ করেন। লর্ড ওয়েলেসলি যখন ভারতে আগমন করেন তখন এদেশে নিজাম, মারাঠা ও টিপু তিনটি শক্তি খুবই প্রবল ছিল। অন্যদিকে নেপোলিয়নের ভারত বিজয়ের হুমকি এবং জামান শাহের দিল্লি আক্রমণের পরিকল্পনা ব্রিটিশ শক্তিকে ভীতবিস্ত্র করে তোলে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ওয়েলেসলি দমবার পাত্র ছিলেন না। খর্দার যুদ্ধে পরাজিত নিজাম-মারাঠা আক্রমণের জয় মিত্রলাভে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সুকৌশলী ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতানীতি প্রয়োগ করে নিজামকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেন। তিনি মহীশূরের টিপু সুলতানকে পরাজিত এবং নিহত করে মহীশূর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অতঃপর তিনি মারাঠা শক্তি সংঘের ধ্বংস সাধন করে সিন্ধিয়া, ভৌসলা এবং হোলকারকে ইংরেজদের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলেন। লর্ড ওয়েলেসলি সম্প্রসারণনীতি অনুসরণ করে দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং ঐ সমস্ত রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীন করে সেখান থেকে ফরাসি প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট করেন। ছলে-বলে-কৌশলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সর্বাঙ্গক করাই ছিল তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূল লক্ষ্য। সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়াও ওয়েলেসলি দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তিনি ইউরোপীয়দের জন্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, বারাক ওবামার মতো লর্ড ওয়েলেসলি বিশ্ব মোড়লে উন্নীত হবার জন্যে কাজ করতেন।

প্রশ্ন ৭ পূর্বকান্দি গ্রামের হিন্দু সমাজে এখনো একটি নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত আছে। এখানে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর বিষপানে আত্মহত্যা করার নিয়ম রয়েছে। পরে স্বামী ও স্ত্রীকে এক চিতায় পোড়ানো হয়। প্রদীপ শহর থেকে লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে এসে এ নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীকে সচেতন করেন। বিভিন্ন মিডিয়ায় বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এতে বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিতে এলে সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করে।

◀ **শিখনফল-৫**

- ‘তুহফাত-উল-মুওয়াহ্বিদীন’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
- কীভাবে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে?
- উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রদীপের কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নেতার আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।
- উক্ত নেতার কর্মকাণ্ড কি শুধু উক্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘তুহফাত-উল-মুওয়াহ্বিদীন’ গ্রন্থটি রচনা করেন রাজা রামমোহন রায়।

বাংলার অধিকার সচেতন ও শিক্ষিত শ্রেণির প্রচেষ্টায় বাংলায় নবজাগরণ ঘটে।

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার মানুষ ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত। শিক্ষা, চাকরিসহ সকলক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে এদেশীয় জনগোষ্ঠী অত্যন্ত মানবতর জীবনযাপন করতে থাকলে এদেশের কিছু শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ এদের মধ্যে অন্যতম। এদের ইতিবাচক ভূমিকার কারণেই এদেশে নবজাগরণ ঘটে।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রদীপের কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পাঠ্য বইয়ে বর্ণিত রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজ থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার দূরীকরণে যারা অবদান রেখে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় অন্যতম। তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা দূরীকরণে তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন, যার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের প্রদীপের কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

তখনকার সমাজে হিন্দু নারীদের স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় পুড়িয়ে মারার প্রথা প্রচলিত ছিল। এ অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথাকেই বলা হয় সতীদাহ প্রথা। এ প্রথা সমাজে হিন্দু বিধবা নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু নারীদের এ করুন পরিণতি মেনে নিতে না পেরে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। এর বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে এ প্রথা বন্ধে উদ্যোগ নিতে বাধ্য করেন। তার একান্ত সহযোগিতায় তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ আইন পাস করেন। ১৮২৯ সালে এ আইনটি প্রণয়নের পর সমাজ থেকে এ অমানবিক প্রথা দূরীভূত হয়।

উদ্দীপকের প্রদীপ সমাজ থেকে সতীদাহ প্রথার মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড দূরীকরণে এলাকাবাসীকে সচেতন করে তোলেন। তাই প্রদীপ যেন রাজা রামমোহন রায়েরই যোগ্য উত্তরসূরি।

ঘ উক্ত নেতা তথা রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড শুধু সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না বলে আমি মনে করি। রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের একজন আধুনিক পুরুষ। অধিকার বঞ্চিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে অধিকারসচেতন করতে তিনি ধর্মীয় ও সামাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে ভারতীয় সমাজকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তার সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য।

তিনি আঠারো শতকের ভারতের গতানুগতিক সনাতনী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি হিন্দি ও মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া বেশ কয়েকটি প্রাচ্য ভাষা যেমন- সংস্কৃত, আরবি ও ফারসিতে উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করেন এবং মুসলমান পণ্ডিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি ইসলাম ধর্মতত্ত্ব ও আইনশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন।

রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে প্রচলিত বহু দেবদেবীর আরাধনাকে অপছন্দ করতেন। এ কারণে নিজের একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রচারের জন্য ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা (পরবর্তীতে ব্রাহ্মসমাজ) প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আত্মীয় সভা (বন্ধুদের সমিতি) নামক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সদ্ভাব গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এভাবে তিনি

ভারতীয় অন্ধকার সমাজকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালান।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, শুধু কুসংস্কার দূরীকরণ নয়, সমাজ সংস্কারেও রাজা রামমোহন রায় অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৮ কথায় আছে পিতা গুণে পুত্র, এমনি এক সাহসী পিতার পুত্র ছিলেন আরবাজ। তিনি তার দেশে অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। রাজধানীতে স্বাধীনতাবৃক্ষ নামক গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে স্বাধীনচেতা মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান আরবাজ। নিজেই দুটি জাহাজের মডেল তৈরি করেন যা নৌবাহিনীর জন্য নির্মিত হয়েছিল। ক্রমেই তিনি বিদেশি শক্তির শত্রুতে পরিণত হন। **◀ পিখনফল-৫**

- ক. পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন কে? ১
- খ. হেস্টিংসের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করো। ২
- গ. আরবাজের সাথে ভারতবর্ষের যে মহানায়কের মিল রয়েছে তার পরিচয় প্রদান করো। ৩
- ঘ. এই ধরনের একজন মহানায়কের সাথেই তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল—মূল্যায়ন করো। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

খ হেস্টিংস গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে সর্বপ্রথম পররাষ্ট্র ও সীমান্ত নীতি বিষয়ে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন।

তিনি লক্ষ করেন যে কোম্পানি ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পড়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজদের অধিকার স্থায়ী করতে দেশীয় রাজাদের যথাসম্ভব ইংরেজ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলার জন্য অধীনতামূলক মিত্রতানীতি সূচনা করেন।

গ আরবাজের সাথে ভারতবর্ষের যে মহানায়কের মিল রয়েছে তিনি হলেন ‘মহীশূরের বাঘ’ নামে খ্যাত টিপু সুলতান।

মহীশূরের সমরনায়ক ও অধিপতি হায়দার আলীর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান। তিনি ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ১০ নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তার আসল নাম ফতেহ আলী খান। স্থানীয় সাধক টিপু মাস্তানের নামানুসারে তাকে টিপু ডাকা হতো। ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে তিনি পিতার মতো আমৃত্যু সংগ্রাম করে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভারতের ইতিহাসে টিপু সুলতান তার ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান দখল করে আছেন। টিপু ছিলেন শিক্ষিত, ধর্মভীরু ও সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী এক স্বাধীনচেতা সুলতান। ফারসি, উর্দু ও কানাড়ি ভাষায় তার দখল ছিল।

১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় ‘ইঙ্গ-মহীশূর’ যুদ্ধ চলাকালে তার পিতা হায়দার আলীর আকস্মিক মৃত্যু হলে তিনি মহীশূরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মতোই তিনি উপলব্ধি করেন, ভারতবর্ষের সকল শক্তির সাধারণ শত্রু হলো ইংরেজ শক্তি। এ শক্তিকে রুখতে না পারলে ভারতবাসীর সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকবে না। এজন্য তিনি ক্রমবর্ধমান ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অসীম সাহসের সাথে অস্ত্র ধারণ করেন। ইংরেজদের নেতৃত্বে মিত্রবাহিনী প্রায় এক মাস টিপু সুলতানকে রাজধানীতে অবরুদ্ধ করে রাখে। বীরেরমতো যুদ্ধ করে ব্রিটিশ বিরোধী অকুতোভয় সৈনিক ১৭৯৯সালে ৪ মে শত্রু সেনার গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ঘ টিপু সুলতানের সাথেই তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৭৯০-১৭৯২ সালে।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময় টিপুর পিতার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ইংরেজরা হায়দার আলী ও টিপুর হাতে পর্যুদস্ত হলে তখন তারা বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে চায় টিপুর সাথে। ম্যাঙ্গালোর চুক্তি অনুযায়ী দু’পক্ষের মধ্যে বৈরিতার আপাত অবসান হয়েছিল সত্য কিন্তু ইঙ্গ-মহীশূর বিরোধিতার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। টিপু ও ইংরেজ উভয়েই বুঝেছিলেন যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

এদিকে আঠার শতকের আশির দশকে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে টিপু ইংরেজ সমর্থক ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা করেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মাদ্রাজে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করলে সম্ভবত ভয়ে তারা অগ্রসর হয়নি। ফলে লর্ড কর্নওয়ালিস মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের তীব্র নিন্দা করেন এবং দাক্ষিণাত্যের টিপুর প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা এবং নিজামের সাথে ত্রিশক্তি মৈত্রী গঠন করেন। নিজে সেনাপতি হিসেবে কর্নওয়ালিস যুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে ভয়ংকর যুদ্ধ হলো এবং কোনো পক্ষই জয়লাভ করতে সক্ষম হয়নি। শেষ পর্যন্ত টিপু পরাজিত হয়ে ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপট্টম-এর চুক্তি স্বাক্ষর করেন। আলোচনা শেষে বলা যায় যে, মহানায়ক টিপু সুলতানের সাথেই তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৯ অধ্যাপক রহমান শ্রেণিকক্ষে আলোচনাকালে বলেন যে, ভারতের ইতিহাসে টিপু সুলতান একটি অবিস্মরণীয় নাম। ইংরেজদের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে তিনি যে বীরত্ব ও নিভীকতা প্রদর্শন করেছেন তা তাকে ভারতের ইতিহাসে দেশপ্রেমিকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। টিপুর চারিত্রিক গুণাবলি এবং জনপ্রিয়তায় ইংরেজগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর চরিত্রকে নানাভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক পি.ই রবার্ট তাঁকে বর্বর বলে অভিহিত করেন। লর্ড কর্নওয়ালিস অসভ্য, উন্মাদ এবং উইলসন তাকে হিন্দুবিদ্বেষী বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সহজ, সরল, বিদ্বান ও ধর্মনিষ্ঠ উদার শাসক। অনেক হিন্দু কর্মচারী তাঁর শাসনামলে রাজকার্যে নিয়োজিত ছিল। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজাকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। একজন সাহসী যোদ্ধা এবং বীর সৈনিক হিসেবে টিপু কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভারতের এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ অসম সাহসী দেশপ্রেমিক বীর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে যুদ্ধ করে গেছেন। **◀ পিখনফল-৫**

- ক. হায়দার আলীর পরিচয় লিপিবদ্ধ কর। ১
- খ. তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলাফল বর্ণনা কর। ২
- গ. “টিপুর চারিত্রিক গুণাবলি ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তার চরিত্রকে নানাভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করে।” ঐতিহাসিকদের এ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. একজন সাহসী যোদ্ধা এবং বীর সৈনিক হিসেবে টিপু কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক হায়দার আলী ছিলেন মহীশূরের স্বাধীন রাজ্যের স্থপতি।

খ ১৭৮৯-৯২ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করেও টিপু সুলতান পরাজিত হয়।

এ পরাজয়ের ফলে ইংরেজগণ তাকে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেন। সন্ধির শর্তানুসারে টিপু সুলতান নগদ ৩,০০০,০০০ টাকা ও রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। সন্ধির প্রতিপালনের নিদর্শন স্বরূপ টিপু দুই পুত্রকে কলকাতায় আটক রাখা হয়। এ সন্ধির মাধ্যমে ইংরেজগণ মালাকার, কুর্গ, দিল্লিগল, বড় মহল লাভ করেন। এ

ছাড়া এ যুদ্ধের ফলে টিপু মারাঠাগণকে মহীশূরের উত্তর-পশ্চিমাংশ ও নিজামকে উত্তর-পূর্বাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এভাবে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে টিপু তার রাজ্যের অর্ধেক হারিয়েছিলেন।

গ। উদ্দীপকের অন্যতম আলোচিত বিষয় অর্থাৎ টিপুর চারিত্রিক গুণাবলি ও জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তার চরিত্রকে নানাভাবে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছিল।

ব্রিটিশ ভারতের আজাদী ইতিহাসে টিপু সুলতান একটি অবিস্মরণীয় নাম। ইংরেজ আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় তিনি ব্যাপক বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি শান্তি স্থাপন করেছিলেন। তবে তার চারিত্রিক গুণাবলি নিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ নানা ধরনের কটুক্তি করে তার চরিত্রকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছে। ঐতিহাসিক P.E Roberts তাকে বর্বর বলে অভিহিত করেন। লর্ড কর্নওয়ালিস অসভ্য, উন্মাদ এবং উইলকম তাকে ধর্মান্ধ হিন্দু বিদ্রোহী বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে টিপু ছিলেন সহজ, সরল বিদ্বান ও ধর্মনিষ্ঠ উদার শাসক। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রজাকে তিনি সমানভাবে দেখতেন। তাই বলা যায় যে, টিপু সুলতান সম্পর্কে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মন্তব্য ঠিক নয় বলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

ঘ। উদ্দীপকের বর্ণিত বিষয় অর্থাৎ মহীশূরের টিপু সুলতান একজন যোদ্ধা এবং বীর সৈনিক হিসেবে ব্যাপক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন বলে আমি মনে করি। আমার মতের সপক্ষে যুক্তি বিশ্লেষণ করা হলো— ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে টিপু সুলতান ব্যাপক সাহসী যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে ইংরেজদের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দান করে ব্রিটিশ সেনাপতি ব্রেইথওয়েটকে পরাজিত করে বিপুল সম্মান ও খ্যাতি লাভ করেন। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে পিতা হায়দার আলী মৃত্যুর পর তিনি মহীশূরের সুলতান পদ লাভ করেন। এর ফলে দাক্ষিণাত্য থেকে তিনি ইংরেজদের বিতাড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি ইংরেজদের পরাজিত করে কতিপয় হীন শর্তে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাঙ্গালোর— এর সন্ধি করতে বাধ্য করেন কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূরের যুদ্ধে তাঁর বিপর্যয় ঘটে। তিনি ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য সকল প্রকার প্রচেষ্টা চালান। তিনি বিদেশি সাহায্য লাভের আশায় ফরাসি জেকোবিন দলের সাথে যোগাযোগ করেন। এ ছাড়া মরিশাসের ফরাসি শাসনকর্তা এবং কাবুলের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু মৌখিক আশ্বাস ছাড়া বোর্ড তাঁকে সক্রিয় সাহায্যদানে এগিয়ে আসেননি। উপরন্তু নিজাম ও মারাঠা সাহায্য লাভে তিনি ব্যর্থ হন। চারদিকে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে টিপু যুদ্ধক্ষেত্রে যে নিভীকতা এবং সেনাপতি হিসেবে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন সেজন্য ভারতের ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ১০। রাশেদ সাহেব কমলগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে সেখানকার উন্নতির জন্য অনেক কল্যাণমূলক সংস্কার প্রবর্তন করেন। বিশেষ করে তিনি উপজেলাটির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমন ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেন। তার চেষ্টায় কমলগঞ্জে শান্তি ফিরে আসে এবং সমাজে নারীদের ওপর কুসংস্কারমূলক অভ্যাসের মাত্রা কমে আসে।

ক. পেশোয়া কী?

খ. অধীনতামূলক মিত্রতানীতি ব্যাখ্যা করে লিখ?

গ. উদ্দীপকের রাশেদ সাহেবের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের যে ইংরেজ শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে— তার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের বর্ণনা দাও।

ঘ. আলোচ্য শাসকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল তার সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা-উক্তিটির মূল্যায়ন কর।

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক। পেশোয়া হলো রাজবংশের নাম।

খ। লর্ড ওয়েলেসলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারে যে কৌশলি নীতি অনুসরণ করেন তা-ই ইতিহাসে ‘অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি’ হিসেবে পরিচিত।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ভারতে যে আঞ্চলিক সার্বভৌম শক্তিগুলোর উত্থান হয় তাদের সাথে ইংরেজ শক্তির ‘সার্বভৌম ক্ষমতার’ প্রশ্নে তিনি এ নীতি অনুসরণ করেন। এ নীতির মাধ্যমে সামরিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক-যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানির কর্তৃত্বই ছিল চূড়ান্ত। একবার এ নীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলে আর বের হওয়া যায় না।

গ। উদ্দীপকের কমলগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান রাশেদ সাহেবের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের যে ইংরেজ শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে তিনি হলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক।

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন বেন্টিনকের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়গুলো লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের শিক্ষা সংস্কার অন্যান্য সংস্কার থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৩ সালের সনদ অনুযায়ী ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ রুপি বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু এই অর্থ ভারতীয় ভাষা (সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি) শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে না ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। দীর্ঘ বিতর্কের পর অবশেষে লর্ড বেন্টিনক সকল বাধা উপেক্ষা করে ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ ইংরেজি শিক্ষার জন্য এই অর্থ ব্যয় হবে বলে ঘোষণা করেন। একই বছরে তিনি কলকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাইয়ে এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউট নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শিক্ষা সংস্কারে লর্ড বেন্টিনক ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব।

ঘ। উদ্দীপকে আলোচ্য শাসক অর্থাৎ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল তার সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা— উক্তিটি যথার্থ।

ভারতবর্ষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সাম্রাজ্য বিস্তারের চেয়ে কল্যাণমূলক সংস্কার কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।

লর্ড বেন্টিনক ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তার সমাজ সংস্কারের জন্য। সতীদাহ প্রথার বিলোপ ও ঠগী দমন হলো বেন্টিনকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি। প্রাচীনকাল থেকে এ দেশের হিন্দু সমাজে ‘সহমরণ’ (মৃত স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যুবরণ করা) এবং ‘অনুমরণ’ (বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবাকে একাকী চিতায় পুড়িয়ে মারা) প্রথার প্রচলন ছিল। সামাজিকতা রক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন বিধবাকে অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোরপূর্বক চিতায় পুড়িয়ে মারত।

লর্ড কর্নওয়ালিস ও তার পরের অনেক গভর্নর জেনারেলই এ আমানবিক প্রথাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এদেশীয় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে বলে তারা শেষ পর্যন্ত ততটা আগ্রহ দেখাননি।

◀ **শিখনকল্প: ৬**

১

২

ভারতবর্ষের কয়েকজন উদারপন্থি সংস্কারক বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করেন লর্ড বেন্টিংক। ১৮২৯ সালে সদর নিয়ামত আদালতের বিচারকদের সমর্থন নিয়ে এক আদেশবলে এ অমানবিক প্রথা রহিত করেন। উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, লর্ড বেন্টিংকের সকল সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ▶ ১১ জনাব কামরুজ্জামান একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি তার এলাকায় অনেক প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন করেন। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় স্ত্রীকে একত্রে পুড়িয়ে মারার যে রীতি প্রচলিত ছিল তার বিলোপ সাধন করেন। এছাড়াও এক শ্রেণির দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করে জনমনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। *◀ শিখনফল: ৬*

- ক. লর্ড বেন্টিংক কার ওপর ঠগীদের দমনের ভার দেন? ১
- খ. হেস্টিংসের অযোধ্যা নীতিটি বর্ণনা কর। ২
- গ. কামরুজ্জামান সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের কাজগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের এখন লর্ড স্মরণীয় হয়ে আছেন? মতামতের স্বপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কর্নেল স্লিম্যান (Colonel Sleeman)-এর ওপর ঠগী দমনের দায়িত্ব দেন।

খ হেস্টিংসের অযোধ্যা নীতিটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির নীতি।

হেস্টিংস উপার্জন বৃদ্ধির জন্য ইংরেজদের শত্রু মারাঠাদের আশ্রয়ে বাস করার অভ্যুত্থানে সম্রাট শাহ আলমকে দেয় বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা বন্দ কর দেন এবং সম্রাটের নিকট হতে বারানসির সন্ধি দ্বারা এলাহাবাদ ও কারা জেলা দুটি অযোধ্যার নবাবকে ৫০ লাখ টাকার বিনিময়ে প্রদান করেন। হেস্টিংস অযোধ্যার শক্তি বৃদ্ধি করে একে মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে শক্তিশালী মধ্যবর্তী রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। আর এটাই ছিল তার অযোধ্যা নীতির মূল উদ্দেশ্য।

গ কামরুজ্জামান সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ভারতবর্ষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক মাদ্রাজ কাউন্সিলের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আগমন করলেও ভেলোরের সিপাহি বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ তাকে ইংল্যান্ডে ফিরিয়ে নেন। পরবর্তীতে ১৮২৮ সালে আবার বেন্টিংককে গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হয়। তিনি প্রাচীনকাল থেকে ভারতের হিন্দু সমাজে চলে আসা নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ‘সহমরণ’ ও ‘অনুমরণ’ প্রথার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের কয়েকজন উদারপন্থি সংস্কারক বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থন ও সহায়তা লাভের মাধ্যমে তিনি ১৮২৯ সালে এ অমানবিক প্রথা বাতিল করেন। এ ছাড়াও তৎকালীন হিন্দু সমাজের প্রথম সন্তানকে গজা নদীতে নিক্ষেপ ও বিবাহ দিতে অক্ষম এমন পিতার কন্যাকে গলা টিপে হত্যা করার মতো ঘৃণ্য প্রথা তিনি রহিত করেন। এছাড়া তৎকালীন ভারতীয় সমাজে ঠগীরা হঠাৎ করে ছদ্মবেশে এসে নিরীহ পথিক, তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীদের

গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত। বেন্টিংক এদের দমন করেন।

সুতরাং বলা যায় যে, কামরুজ্জামানের কর্মকাণ্ডের সাথে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারমূলক কাজগুলোর মাধ্যমে একজন লর্ড ভারতীয় উপমহাদেশে স্মরণীয় হয়ে হয়ে আছেন। তিনি হলেন লর্ড বেন্টিংক। লর্ড বেন্টিংয়ের সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ হলো সামাজিক সংস্কার।

লর্ড বেন্টিংক ভারতীয় সমাজব্যবস্থা থেকে জঘন্য সতীদাহ প্রথা বিলোপ করে ইতিহাসে স্মরণীয় আছেন। বহুকাল থেকেই হিন্দু সমাজে ‘সহমরণ’ ও ‘অনুমরণ’ প্রথার প্রচলন ছিল। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা লোকাচার রক্ষার জন্যে বিধবা স্ত্রীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুড়িয়ে মারত। এ অমানবিক প্রথায় ব্যথিত হয়ে বেন্টিংক ১৮২৯ সালে এটা বিলোপ করেন।

তৎকালীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী দেবতার স্তুতির উদ্দেশ্যে প্রথম সন্তানকে গজায় নিক্ষেপ এবং কন্যাদায় গ্রন্থ পিতার কন্যা সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করার নিয়মও তিনি চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

ঠগীদমন বেন্টিংয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কার। মুঘলদের পতনের যুগে ঠগী নামে একদল দস্যু ভারতের সর্বত্র ত্রাস সৃষ্টি করে। এরা ছদ্মবেশে তীর্থযাত্রী ও পথিকদের অনুসরণ করত এবং সুযোগ পেলেই তাদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে সর্বস্ব লুট করত। লর্ড বেন্টিংক ঠগী দমন করার জন্যে কর্নেল স্লিম্যান (Sleeman)-এর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। স্লিম্যান ঠগীদের কঠোর হস্তে দমন করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে লর্ড বেন্টিংক স্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ▶ ১২ সূর্যচরণ ছিলেন ‘ক’ নামক বিশাল সাম্রাজ্যের এক অংশের রাজা। তিনি অপূত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য ‘ক’ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তার পালিত পুত্র রাজ্যের দাবি করে ব্যর্থ হয়। ফলে ‘ক’ সাম্রাজ্য ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে। *◀ শিখনফল: ৭*

- ক. ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় কত সালে? ১
- খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. উদ্দীপকটি লর্ড ডালহৌসির কোন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত নীতির ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় ১৮৫৭ সালে।

খ ফরায়েজি আন্দোলন হচ্ছে হাজি শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন।

১৮১৮ সালে মক্কা হতে স্বদেশে ফিরে তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থা দেখে সামাজিক অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। ক্রমেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে সর্বহারা কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য তিনি এক আন্দোলন পরিচালনা করেন। যা ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকটি লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বত্ববিলোপ নীতির মূলকথা হলো- ব্রিটিশ অধীন বা ব্রিটিশ শক্তি দ্বারা সৃষ্ট কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজবংশের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে

সেই রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়বে। কোনো দত্তকপুত্রকে এসব রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না। লর্ড ডালহৌসি তার স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ১৮৪৮ সালে সাতারা রাজ্য, ১৮৫০ সালে সম্বলপুর রাজ্য, ১৮৫৩ সালে নাগপুর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এছাড়া ১৮৫৩ সালে স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমেই তিনি বাসীর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অনুরূপভাবে আরো কিছু রাজ্য যেমন- ভগৎ রাজ্য, উদয়পুর, রাজস্থানের করৌলি প্রভৃতি রাজ্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' নামক সাম্রাজ্যের এক অংশের রাজা সূর্যচরণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য 'ক' সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। তার পালিত পুত্র রাজ্যের দাবি করে ব্যর্থ হয়। উল্লিখিত এ ঘটনার সাথে লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতি মূলত লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির প্রতি ইজিত বহন করে।

স্বত্ববিলোপ নীতির মূলকথা হলো- ব্রিটিশ অধীন বা ব্রিটিশ শক্তির দ্বারা সৃষ্ট কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজবংশের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে সেই রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়বে। কোনো দত্তকপুত্রকে এসব রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না। লর্ড ডালহৌসি এ নীতির ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন।

স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের ফলে ১৮৪৮ সালে সাতারা রাজ্যের রাজা মারা গেলে তার দত্তকপুত্রের দাবি অস্বীকার করে ডালহৌসি রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ক্রমান্বয়ে ১৮৫০ সালে সম্বলপুর, ১৮৫৩ সালে নাগপুর এবং বাসী রাজ্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। শতদ্রু নদীর নিকট ভগৎ রাজ্য, মধ্যপ্রদেশে উদয়পুর, রাজস্থানের করৌলি প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় সূর্যচরণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য 'ক' সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। যার ফলে 'ক' সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। যা স্বত্ববিলোপ নীতির অনুরূপ। তাই বলা যায় দেশীয়দের অসন্তোষ সত্ত্বেও এ নীতি প্রয়োগ করা হয় এবং এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে।

প্রশ্ন ১৩ গণি মিয়া একজন আদর্শ কৃষক। চার বিঘা জমি চাষাবাদ করে কোনো রকমে সংসার চালায়। বিদেশে এক সংস্থার প্রলোভনে স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কৃষকদের দ্বারা সূর্যমুখী ফুলের চাষের প্রকল্প গ্রহণ করেন। তিনি গণি মিয়াকে ডেকে বললেন, তোমার যে চার বিঘা জমি রয়েছে তার মধ্যে থেকে উর্বর দুই বিঘা জমিতে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করতে হবে। এর আগে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করে অনেক কৃষক পথে বসেছে। তাদের খরচের টাকাও ওঠেনি। তাই গণি মিয়া সূর্যমুখী চাষ করতে অনিচ্ছা জানায়। চেয়ারম্যান তেলে-বেগুনে জলে ওঠে বলে, সূর্যমুখী ফুলের চাষ বাধ্যতামূলক। পর্যায়ক্রমে সবাইকে এ চাষ করতে হবে। একদিন কৃষকরা সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ঘেরাও করে। চেয়ারম্যান উপায় না পেয়ে সূর্যমুখী চাষ কৃষকদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলেন।

◀ সিখনফল-৮

- ক. ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?
- খ. এনফিল্ড রাইফেল বলতে কী বোঝায়?
- গ. সূর্যমুখী ফুলের চাষের ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের এমন কোন চাষের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. সূর্যমুখী ফুলের চাষ বাধ্যতামূলক করায় চাষিরা ইউনিয়ন পরিষদ ঘেরাও করে—বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং।

খ এনফিল্ড রাইফেল এক ধরনের বিশেষ বন্দুক। এই বন্দুকের গুলি বা টোটা দাঁত দিয়ে ছিড়ে বন্দুকে ভরতে হতো।

কার্তুজটিকে পিচ্ছিল রাখার জন্য এতে তথাকথিত গরু ও শূকরের মিশ্রিত চর্বি ব্যবহার করা হতো। যা মুসলমান এবং হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। ফলে মজল পাণ্ডে ব্যারাকপুরের এক সিপাহি বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এ বিদ্রোহ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যা ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত।

গ সূর্যমুখী ফুলের চাষের ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের নীলচাষের মিল পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। অন্যদিকে আমেরিকার উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর ইংরেজ বণিকদের সেখানকার নীলের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। এ দু'কারণে ইংরেজরা বাংলাদেশকে নীলচাষের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়। কোম্পানি শাসনামলে নীলকরণ প্রজাদের ওপর জোর জবরদস্তি করে সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে নীলচাষে বাধ্য করত এবং নীলচাষের খরচ বিবেচনা না করে বেধে দেওয়া দামে তা বিক্রি করতে হতো। কোনো কৃষক নীলচাষে অনিচ্ছুক হলে তার ওপর চলত অমানবিক নির্যাতন। নীলচাষের ফলে অনেক কৃষক পথে বসে। পরবর্তীতে নীলচাষিরা নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ এরূপ প্রবল আকার ধারণ করলে, সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। হাজার হাজার নীলচাষিদের আন্দোলনের মুখে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে নীলচাষ সংক্রান্ত নীল কমিশন গঠন করা হয়। নীল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার নীলচাষ কৃষকদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন বলে আদেশ জারী করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, বিদেশে এক সংস্থার প্রলোভনে স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কৃষকদের দ্বারা সূর্যমুখী ফুলের চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং গণি মিয়াকে তার চার বিঘার জমির মধ্যে উর্বর দুই বিঘা জমিতে সূর্যমুখী ফুলচাষ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু সূর্যমুখী ফুলচাষ লাভজনক না হওয়ায় গণি মিয়া তা চাষ করতে অনিচ্ছা জানালে চেয়ারম্যান তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে; বলে, সূর্যমুখী ফুলের চাষ বাধ্যতামূলক। একদিন কৃষকরা সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ঘেরাও করে এবং চেয়ারম্যান উপায় না দেখে সূর্যমুখী চাষ কৃষকদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সূর্যমুখী চাষের ঘটনা নীলচাষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ সূর্যমুখী ফুলের চাষ বাধ্যতামূলক করায় চাষিরা ইউনিয়ন পরিষদ ঘেরাও করে অর্থাৎ নীলচাষ বাধ্যতামূলক করায় নীলচাষিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত নীল বিদ্রোহ বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে নীলের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়া বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজরা নীলচাষের প্রচলন করে। নীলচাষ অলাভজনক হওয়ায় কৃষকরা নীলচাষে মোটেই আগ্রহী ছিল না। কৃষকদের নীলচাষে অনীহা থাকায় ইংরেজরা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ফলে তারা নানারকম উৎপীড়নের মাধ্যমে কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করে।

কোনো কৃষক নীলচাষে অনিচ্ছুক হলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলচাষিরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে যশোর, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুরের কৃষকরা একতাবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন কোনো অবস্থায় তারা আর নীলচাষ করবে না। অবস্থা বুঝে ছোট লাট জন স্যার পিটার গ্রান্ট ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে কৃষককে দণ্ড প্রদানের এক আইন পাস করেন এবং ঐ আইনের দোহাই দিয়ে নীলকররা ত্রাসের রাজত্ব কায়ম করে। নীলকরদের বিরুদ্ধে নদীয়া জেলার ২৭টি গ্রামের কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। হাজার হাজার নীলচাষিদের আন্দোলনের চাপে সরকার নীলচাষ ইচ্ছাধীন বলে আদেশ জারী করেন।

উপমহাদেশে নীল বিদ্রোহ ছিল একটি সফল আন্দোলন। নীল বিদ্রোহের মাধ্যমেই ইংরেজ সরকার এ দেশীয়দের কাছে প্রথম মাথানত করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন ▶ ১৪ উদয়ন গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলো ফড়িয়া মধ্যস্বত্বভোগী ও দাদন ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের শিকার। ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই মানুষেরা ধর্মের অবশ্য পালনীয় কাজগুলোর পরিবর্তে ঝাড়ফুক, মানত, পিরপূজা, কবরপূজা, জন্মউৎসব ও মহরম পালন এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে বেশি উৎসাহী। গ্রামের আদর্শবান যুবক সালমান গ্রামবাসীকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড হতে বিরত থেকে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধেও সোচ্চার করে তোলেন।

◀ *শিখনফল: ৮*

- ক. বাঁশের কেলা কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১
- খ. স্বত্ববিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. সালমানের আহবানে ভারতে সংঘটিত কোন আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মতো পাঠ্যপুস্তকের আন্দোলনটিও ধর্মীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না— মতামত দাও। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঁশের কেলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সৈয়দ মীর নিসার আলী (তিতুমীর)।

খ ব্রিটিশ শক্তির ওপর নির্ভরশীল দেশীয় রাজ্যগুলো কুক্ষিগত করার জন্য যে নতুন নীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল তাই স্বত্ববিলোপ নীতি।

এ নীতির মূলকথা হলো— ব্রিটিশদের অধীন কিংবা ব্রিটিশ শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে মৃত্যুবরণ করলে সে রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। কোনো পালিত পুত্রকে এসব রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না।

লর্ড ডালহৌসি ঘোষণা করছিলেন যে, কেবল আশ্রিত বা নির্ভরশীল (protected) বা (Dependent States) হিন্দু রাজ্যগুলোর ওপরই স্বত্ববিলোপ নীতি প্রযুক্ত হবে। এ নীতির প্রয়োগের ফলে সাতারা, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

গ সালমানের আহবানে ভারতের ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য গ্রামের আদর্শবান যুবকের কর্মকাণ্ড হাজী শরীয়তুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফরায়েজি কথাটি 'ফরজ' শব্দ থেকে এসেছে। ইসলামে 'ফরজ' শব্দটির অর্থ 'যা অবশ্য কর্তব্য'। মূলত 'ফরজ' শব্দ থেকেই ফরায়েজি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন এ আন্দোলনের প্রবর্তক। তিনি বহুদিন যাবৎ মক্কা ও মিসরের কায়রোতে অবস্থান করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে লক্ষ করেন যে, মুসলিম সমাজে এমন

কিছু আচার-বিশ্বাস প্রবেশ করেছে যা ইসলামের মূল চেতনার পরিপন্থী। এজন্য তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রচলিত মুসলিম রীতি নীতিকে কুরআন এবং হাদিসের আলোকে বিশুদ্ধতা দান করার জন্য এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তার পরিচালিত এ আন্দোলনই 'ফরায়েজি আন্দোলন' নামে পরিচিত। তিনি মনে করতেন, যেহেতু ভারতবর্ষ বিধর্মীদের দখলে তাই এটি 'দার-উল-হারব' বা 'শত্রুদের দেশ'। এজন্য এখানে জুমার নামাজ ও দুই ঈদের জামাত পড়া উচিত নয়। তিনি সর্বত্র এই মতবাদ প্রচার করেন যে, জমি আত্মাহর দান। সুতরাং জমিদারের কর ধার্য করার অধিকার নেই। তিনি অতীত অপরাধের জন্য 'অনুতাপ করা' এবং ভবিষ্যতে সুখ-শান্তির জন্য পবিত্র আচারণের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি ইসলাম পরিপন্থী সব বিশ্বাস-আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে যা অবশ্য করণীয় তা পালন করার জন্য জোর দেন। তিনি পিরপূজা, কবর পূজা, জন্ম উৎসব, মহরম পালন প্রভৃতি বর্জন করার আহ্বান জানান।

ঘ উদ্দীপকের মত পাঠ্যপুস্তকের ফরায়েজি আন্দোলনটিও ধর্মীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে আমি মনে করি।

হাজী শরীয়তুল্লাহর আহ্বানে পূর্ব বাংলার দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। তিনি ফতোয়া দেন যে কৃষকরাই জমির প্রকৃত মালিক; জমিদারদের এতে কোনো অধিকার নেই। প্রাচীন পন্থি জমিদারগণ শরীয়তুল্লাহর বিরোধিতা করে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়া এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুদু মিয়া অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। দুদু মিয়ার আহ্বানে কৃষকেরা জমিদারদের খাজনা দেয়া বন্ধ করলে হিন্দু জমিদাররা রায়তদের (প্রজাদের) ওপর অত্যাচার শুরু করে। দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করে। দুদু মিয়াকে দমন করার জন্য জমিদারগণ নীলকরদের যোগসাজশে ফৌজদারি আদালতে অনেক মামলা দায়ের করে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাকে দমন করতে তারা ব্যর্থ হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় তাকে রাজবন্দি হিসেবে বন্দি করে রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ঢাকার বংশাল রোডে কিছুকাল বসবাস করেন। এখানেই অসুস্থ হয়ে ১৮৬২ সালে তিনি মারা গেলে ফরায়েজি আন্দোলন নেতৃত্বের অভাবে থেমে যায়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, ফরায়েজি আন্দোলনটি ধর্মীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না—উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৫ আব্দুল ছাত্তার মহাস্থানগড়ে বেড়াতে গিয়ে তার মনে পড়ে যায় এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা যারা বিভিন্ন দরগাহ ও তীর্থস্থানগুলোতে দল বেধে ঘুরে বেড়াতো। তাদের এ কর্মকাণ্ডে ব্রিটিশরা বাধা প্রদান করলে তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহ পরবর্তী বিভিন্ন সংগ্রামের পটভূমি প্রস্তুতে বিশেষ অবদান রাখে।

◀ *শিখনফল: ৮*

- ক. স্বত্ববিলোপ নীতি কে প্রবর্তন করেন। ১
- খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আব্দুল ছাত্তারের মহাস্থানগড় মাজার দেখে কোন সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ে যায়? উক্ত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত বিদ্রোহের ফলাফল মূল্যায়ন কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন লর্ড ডালহৌসি।

খ হাজি শরীয়তুল্লাহ বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রচলিত মুসলিম রীতিনীতিকে কোরআন এবং হাদিস এর আলোকে বিশুদ্ধতা দান করার জন্য যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন ইতিহাসে তাই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

ফরায়েজি কথাটি ‘ফরজ’ শব্দ থেকে এসেছে। ইসলামে ‘ফরজ’ শব্দটির অর্থ অবশ্য কর্তব্য। মূলত ‘ফরজ’ শব্দ থেকেই ফরায়েজি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। হাজি শরীয়তুল্লাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে লক্ষ করেন যে, মুসলিম সমাজে এমন কিছু আচার-বিশ্বাস প্রবেশ করেছে যা ইসলামের মূল চেতনার পরিপন্থী। এজন্য তিনি কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশুদ্ধতা দানের জন্যই এ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি পিরপূজা, কবর পূজা, জন্ম উৎসব, মরমমে শোক পালন প্রভৃতি বর্জন করার আহ্বান জানান।

গ আবদুল ছাত্তারের মহাস্থানগড় মাজার দেখে ফকির-সন্ন্যাসীদের কথা মনে পড়ে যায়।

সুলতানি আমল থেকেই মাদারিয়া সুফি সম্প্রদায়ের ফকির এবং হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের জীবনচারণ একই রকম ছিল। এরা মুক্ত ও স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করতো। মুষ্টি ভিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। এরা সাথে হালকা অস্ত্র বহন করতো। ধর্মীয় উৎসব বা তীর্থস্থান পরিদর্শন উপলক্ষে তারা দলবদ্ধ ভ্রাম্যমান সংঘে বিভক্ত হয়ে সারাদেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতো।

পলাশী যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ফকির-সন্ন্যাসীদের গতিবিধিতে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের তীর্থস্থান দর্শনের ওপর কর আরোপ করে। ভিক্ষা বা মুষ্টি সংগ্রহ করাকে বে-আইনি ঘোষণা করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ডাকাত বা দস্যু হিসেবে ঘোষণা করে। এসব কারণে ফকির-সন্ন্যাসীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম শুরু করে। তাদের আক্রমণের লক্ষ ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাচারি এবং নায়েব গোমস্তাদের বাড়ি।

পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ফকির-সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করেন।

ঘ উক্ত বিদ্রোহ তথা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিদ্রোহগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। ফকির-সন্ন্যাসীদের গতিবিধিতে বাধা, তীর্থস্থান দর্শনে করারোপ, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহ বে-আইনি এবং তাদেরকে ডাকাত বা দস্যু হিসেবে ঘোষণা করলে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এ আন্দোলনে ফকিরদের নেতৃত্ব দেন ফকির মজনু শাহ এবং সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে একদল ফকির বাকেরগঞ্জ জেলার কোম্পানির ফ্যাক্টরি আক্রমণ করে দখল করে নেয়। একই বছর তারা রাজশাহীতে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে হানা দিয়ে ফ্যাক্টরি প্রধান মি. বেনেট কে বন্দি করে। বিহারের পাটনায় নিয়ে তাকে হত্যা করে। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ডি মেকেঞ্জির নেতৃত্বে ফকিরদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী রংপুরে অভিযান প্রেরণ করলে এতে কিংসহ বহু ইংরেজ সৈনিক হতাহত হয়। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ফকির মজনু শাহ উত্তরবঙ্গে ইংরেজবিরোধী শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে মজনু শাহ তার দুই হাজার অনুসারীসহ রাজশাহীতে কোম্পানির অফিস আক্রমণ ও লুণ্ঠ করেন। পরের বছর অপর এক সংঘর্ষে সন্ন্যাসীদের হাতে ক্যাপ্টেন টমাস পরাজিত ও নিহত হলে তাদের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি

পায়। ১৭৮৭ সালে মজনু শাহ মারা গেলে ফকিরদের নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ, সোবহান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ প্রমুখ। একই বছর ভবানী পাঠকের সন্ন্যাসী বাহিনীকে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য অতর্কিত আক্রমণ করে ভবানী পাঠক ও তার দুই সহযোগীকে হত্যা করে। এদিকে ইংরেজদের শক্তিও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ব্যাপক ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমন করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, এ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ পরবর্তী ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ১৬ লালবাগ কেল্লা দেখে এক ছাত্র তার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করল, এটি কেন নির্মাণ করা হয়েছিল। উত্তরে শিক্ষক বললেন যে, সামরিক কারণে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মূলতঃ যুদ্ধের আক্রমণ প্রতিরোধে এবং সৈন্য ও গোলা-বাবুদ নিরাপদে রাখতে কেল্লাটি ব্যবহৃত হতো। তবে বাংলার ইতিহাসে ব্রিটিশ ও জমিদার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতে ভিন্ন উপায়ে বিশেষ একটি কেল্লা নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলার সকল প্রকার আন্দোলনে কেল্লাটির অনুপ্রেরণা রয়েছে। তাই বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এটি বিশেষ গুরুত্ববহ।

◀ পিছনফল: ৮

- ক. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন কে? ১
- খ. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সামাজিক সংস্কারের জন্য বিখ্যাত কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ কেল্লাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কেল্লার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর তোমার পঠিত কেল্লাটি পরবর্তী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পথের দিশারী? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক লর্ড ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন।

খ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সামাজিক সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। কেননা তার সংস্কারসমূহ গোটা সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছিল।

বেন্টিনক সদর নিজামত আদালতের জজদের সহায়তায় ১৮২৯ সালে ‘১৭নং রেগুলেশন আইন’ দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এই রেগুলেশন প্রথম বাংলায় চালু করা হয়। পরে ১৮৩০ সালে সারা ভারতবর্ষে কার্যকর করা হয়। এছাড়া তিনি তৎকালীন হিন্দু প্রথা অনুযায়ী প্রথম সন্তানকে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ এবং কন্যা সন্তানকে গলাটিপে হত্যা করার নিয়মও রহিত করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ কেল্লাটি আমার পাঠ্যবইয়ের সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার কথা মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ব্রিটিশ ও জমিদার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতে কেল্লা নির্মাণ এবং পরবর্তীতে সকল আন্দোলনে কেল্লাটির অনুপ্রেরণা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মূলত তিতুমীর ব্রিটিশ শক্তিশালী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিশ্বস্ত শিষ্য গোলাম মাসুম ও মিসকিন খাঁর পরিকল্পনায় নারকেল বাড়িয়ার গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। এটি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নামে পরিচিত। কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে একটি সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করা হলে তিনি বাঁশের কেল্লার মাধ্যমে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা করেন। এ যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে জেনেও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু ইংরেজদের গোলায় তোপের মুখে তার বাঁশের কেল্লা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। তবু

বীরের মতো লড়াই করে তিনি বহু অনুচরসহ নিহত হন। তিতুমীরের বাঁশের কেলা ধ্বংস হলেও তা যুগ যুগ ধরে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা ও প্রেরণা যুগিয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি আমার পঠিত কেলাটি তথা তিতুমীরের বাঁশের কেলাটি পরবর্তী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পথের দিশারি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে জমিদার, নীলকর ও শোষক শ্রেণির অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিতুমীর ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি হিন্দু-মুসলিম সকল নিপীড়িত জনগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের সংগ্রামে ঐক্যবন্ধ করে সামরিক শিক্ষা দেন। তিনি শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য নারকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেলা নির্মাণ করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত কেলাটি ধ্বংস হয়েছিল তবুও এই কেলাটি পরবর্তী মানুষের সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তার বাঁশের কেলা নির্মাণের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, দৃঢ় মনোবল থাকলে সবকিছুই মোকাবিলা করা সম্ভব। ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংবলিত বাহিনীর কাছে তার বাঁশের কেলা নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। দেশপ্রেম ও দৃঢ় মনোবল থাকলে যে সকল বাধা দূর করা সম্ভব তিনি আমাদের তা শিখিয়েছে। তার আন্দোলন ব্যর্থ হলেও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের অত্যাচার, অবিচার বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অন্যায় ও অত্যাচারীর সাথে আপোশহীন ভাবে সংগ্রাম করে জীবন বিসর্জন দিয়ে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা যুগে যুগে স্বাধীনতাকামীদের প্রেরণা দিয়েছে। পরিশেষে বলা যায় যে, তিতুমীরের বাঁশের কেলাটি প্রকৃত অর্থেই মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পথের দিশারি।

প্রশ্ন ▶ ১৭ সম্প্রতি একটি দেশের সরকারি কর্মচারীরা তাদের সরকারের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের দাবি সরকার তাদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাছাড়া তারা দাবি করছে, ভিনদেশি এ সরকার নাকি তাদের ধর্ম নিয়েও তামাশা করছে। এসব কারণে কর্মচারীরা একজোট হয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। দেশের সাধারণ জনগণও তাদের এ আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে। তবে তাদের এ আন্দোলন সরকারের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী আর চতুরতাপূর্ণ কৌশলের কাছে কতটা সফল হবে বিশ্লেষকরা সেটা নিয়ে চিন্তিত।

- ক. ইতিহাসে বর্তমান যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীগণ কী নামে পরিচিত ছিল? ১
- খ. টিপু সুলতানের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২
- গ. উল্লিখিত দেশটির সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনের সাথে এ উপমহাদেশের কোন আন্দোলনের সম্পৃক্ততা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনাসহ ঐ সংগ্রামের ব্যর্থতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করো। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইতিহাসে বর্তমান যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীগণ রোহিলা আফগান নামে পরিচিত ছিল।



খ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করতে যারা আমৃত্যু যুদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে টিপু সুলতান অন্যতম।

তিনি ছিলেন মহান যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা। তার ব্যক্তিগত পাঠাগারে ধর্ম, ইতিহাস, রণনীতি, চিকিৎসা ও গণিতের অনেক গ্রন্থ ছিল। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক মানুষ। নিজ রাজ্যে তিনি আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন। ফলে রাজ্যটি ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

গ উল্লিখিত দেশটির সরকারি কর্মচারীদের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে উপমহাদেশের সিপাহি বিদ্রোহের মিল পাওয়া যায়। কোম্পানির শাসনামলে সিপাহিদের বেতন-ভাতা কম দেওয়া হতো। অল্প বেতনে তাদেরকে সুদূর আফগানিস্তান ও ব্রহ্মদেশে পাঠানো হতো। এসবের বিরুদ্ধে সিপাহিদের মনে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে এমন সময়ে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে এনফিল্ড নামে এক প্রকার বন্দুক ব্যবহারের প্রচলন হয়। উক্ত বন্দুকে ব্যবহৃত কার্তুজ ছিল তৈলাক্ত। এ কার্তুজ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে বন্দুকে ভরতে হতো। এদিকে গুজব রটে যে উক্ত কার্তুজ গরু ও শূকরের চর্বি দ্বারা তৈরি। এই গুজবে ভারতব্যাপী সিপাহিগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের কূটচালে মুসলমানগণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরি হারিয়ে নিঃস্ব ও সম্বলহীন হয়ে পড়ে। এতে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ব্রিটিশদের স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা হিন্দু জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারাও ব্রিটিশদের প্রতি রুষ্ট হয়। তাই উপমহাদেশের সমগ্র হিন্দু মুসলমান সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছিল।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও এর ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। এটি ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে। এ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট দ্বারা ভারতীয়দের জন্যে সরকারি উচ্চপদ সংরক্ষিত হয়। সবচেয়ে বড় সাফল্য এই যে, এ সংগ্রাম ছিল দেশপ্রেম ও প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। ঐতিহাসিক বিশ্লেষকগণ ১৮৫৭ সালের সংগ্রামকে মহাবিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন। তারা এ সংগ্রামকে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো—

প্রথমত, ভারতের এ স্বাধীনতা সংগ্রাম সুসংগঠিত ছিল না। নেতৃত্ব ছিল বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। ফলে বিদ্রোহ শক্তিশালী রূপ নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, সিপাহিদের রণকৌশল জানা থাকলেও ব্রিটিশ সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। অপরপক্ষে ব্রিটিশ বাহিনীর সমর রসদ ছিল পর্যাপ্ত। তৃতীয়ত, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে সাংগঠনিক দুর্বলতা ও খবরা-খবর দেওয়ার অভাব দেখা দেয়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সিপাহি বিদ্রোহের নেতাগণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খবরা-খবর রাখতে ও যোগাযোগ করতে পারেননি। ফলে সংঘবন্ধ আক্রমণ ও সহযোগিতার অভাব ঘটে। চতুর্থত, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো দেশীয় রাজাগণ স্থানীয় জমিদার ও ভারতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সিপাহি বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং সিপাহিদের সাহায্য না করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা।



প্রশ্ন ▶ ১ অল্লবয়সী মি. মেটলে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী হিসেবে যোগদান করেন এবং নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে আসেন। খুব কম সময়ে নিজ যোগ্যতায় তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বড় পদে আসীন হন। তিনি দেশটির বিভিন্ন রকম সংস্কার সাধন করে শাসন ব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। ◀ *শিখনফল-১*

- ক. কে ভারতবর্ষে প্রথম দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন? ১
- খ. নিয়ামক আইন (১৭৭৩) বলতে কী বুঝানো হয়? ২
- গ. মি. মেটলে-এর সাথে ভারতবর্ষে যে ইংরেজ শাসকের মিল রয়েছে, তার রাজস্ব সংস্কারের ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. ভারতবর্ষে মি. মেটলে-এর মতো একজন শাসক বিচার বিভাগের সংস্কারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন— মূল্যায়ন কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings) ভারতবর্ষে প্রথম দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন।

খ ভারতে ব্রিটিশ শাসন কাঠামো প্রবর্তনে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ (Frederick North) যে আইন প্রণয়ন করেন, ইতিহাসে তা নিয়ামক আইন বা রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Regulating Act) নামে পরিচিত।

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট ভারতে ব্রিটিশ শাসন কাঠামো প্রবর্তনে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। এ আইন মোতাবেক সর্বপ্রথম ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির কলকাতাভিত্তিক কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এ আইনটির সংক্ষিপ্ত নাম দেওয়া হয় ‘North's Regulating Act, 1773’। বাংলায় বলা হয় নিয়ামক আইন।

গ মি. মেটলে-এর সাথে ভারতবর্ষে যে ইংরেজ শাসকের মিল রয়েছে, তিনি হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস।

হেস্টিংসের অভ্যন্তরীণ শাসননীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিচারব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা। এ লক্ষ্যে তিনি দ্বৈত শাসনব্যবস্থার বিলোপ সাধন করেন এবং শাসন ও রাজস্ব বিভাগ কোম্পানির অধীনে স্থাপন করেন। জনসাধারণকে অত্যাচার করার অপরাধে রেজা খান ও সেতাব রায়কে তিনি পদচ্যুত করেন। পাশাপাশি নায়েবে দেওয়ানের পদ বিলোপ করেন এবং রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতি দূর করতে পদক্ষেপ নেন। রাজস্ব বিভাগের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি রাজকোষ মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতায় স্থানান্তর করেন এবং একটি রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন। এ ছাড়াও রাজস্ব খাতে আয় বৃদ্ধির জন্য তিনি পাঁচ বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ মূল্যে জমিদারি ইজারা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন, যা ‘পাঁচসাল বন্দোবস্ত’ নামে পরিচিত। জমিদারগণ এ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রজাদের ওপর জোর-জুলুম করে অর্থ আদায় করত। এতে প্রজাদের দুঃখ দুর্দশা সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন তিনি এই প্রথার বদল ঘটান। চালু হয় ‘একসাল বন্দোবস্ত’।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, মি. মেটলে প্রতিষ্ঠানের বড় পদে আসীন হয়ে উল্লিখিত দেশটির বিভিন্নরকম সংস্কার সাধন করে শাসন ব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেন।

ঘ ভারতবর্ষে ইংরেজ শক্তি সুসংহতকরণে হেস্টিংসের অবদান অনস্বীকার্য।

ওয়ারেন হেস্টিংস বিচার বিভাগের সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মুঘল বিচারব্যবস্থার অনুসরণে তিনি বিচার বিভাগকে শৃঙ্খলাপূর্ণ করার নীতি গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় আইন চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করেন, যাতে বাণিজ্য বিভাগ শাসন কাজে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। পাশাপাশি তিনি বিচার বিভাগকে রাজস্ব বিভাগ থেকে পৃথক করেন। তাছাড়া তিনি প্রত্যেক জেলায় একটি করে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন। ইংরেজ কালেক্টর ও দেশীয় বিচারকগণ যথাক্রমে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতের বিচারক ছিলেন। এছাড়া তিনি দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমার আপিলের জন্য ‘সদর দেওয়ানি আদালত’ ও ‘সদর নেজামত আদালত’ নামে দুটি উচ্চ আদালত স্থাপন করেন। গভর্নর ও তার পরিষদের দুজন সদস্য নিয়ে গঠিত হতো দেওয়ানি আদালত। আর ফৌজদারি আদালত গঠিত হতো কাজি ও মুফতিদের নিয়ে। হিন্দু ও মুসলিম আইন অনুসারে এ আদালতে বিচার কাজ পরিচালনা হতো।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতবর্ষে বিচার বিভাগের সংস্কারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

প্রশ্ন ▶ ২ ইউসুফ সাহেব ভারতে ভ্রমণ করার সময় তাদের একটি রাজ্যের পাবলিক লাইব্রেরিতে একটি বই পড়ে জানতে পারেন, একজন নবাব টিপু সাহেবের চরম শত্রু। রাজ্য সংক্রান্ত বিবাদে বিদেশি এক ব্যবসায়ীগোষ্ঠী নবাবকে সমর্থন করলে টিপু সাহেব ব্যবসায়ীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এরপর টিপু সাহেব ব্যবসায়ীদের শান্তির প্রস্তাব দিলে তারা প্রত্যাখ্যান করেন। এক সময় টিপু সাহেব নিজের নিরাপত্তার জন্য অন্য এক প্রভাবশালী লতিফের সাথে প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এক সময় লতিফ ও টিপুর যৌথ বাহিনী বিদেশি শাসকশ্রেণিকে আক্রমণ করলে একটি যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

◀ *শিখনফল-২*

- ক. মিরন কাটরার যুদ্ধে রোহিলা সর্দার কে ছিল? ১
- খ. লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদ নীতির উদ্দেশ্য কী ছিল? ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. ইউসুফ সাহেবের পড়া বইটিতে পাঠ্যবইয়ের যে যুদ্ধের ইজিত পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের সমস্যাটি ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল — মতামত প্রদান করে যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মিরন কাটরার যুদ্ধে রোহিলা সর্দার ছিলেন হাফিজ রহমাত খান।

খ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার সৃষ্টি এবং শাসনের প্রসার ঘটাতে লর্ড ডালহৌসি সাম্রাজ্যবাদ নীতি প্রণয়ন করেন।

ইংল্যান্ড কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত যে সকল সাম্রাজ্যবাদী শাসক প্রেরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে লর্ড ডালহৌসি ছিলেন চরম প্রকৃতির। লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদ নীতির উদ্দেশ্য হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শাসনের প্রসার, ইংরেজ সাম্রাজ্যের সংহতি স্থাপন ও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার সৃষ্টি। তিনি তার সাম্রাজ্যবাদ নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে সমর্থ ছিলেন।

গ উদ্দীপকের ইউসুফ সাহেবের পড়া বইটিতে পাঠ্যবইয়ের ১ম ইজা-মহীশূর যুদ্ধের ইজিত পাওয়া যায়।

হায়দার আলীর উত্থানে ইংরেজরা তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। এরপর পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, সংশয় ও ছোটখাটো ঘটনার জের ধরে ১ম ইজা-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। হায়দার আলীর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ফরাসি শক্তির সাথে তার আঁতাত মাদ্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল।

এ যুদ্ধে কোম্পানি ও মারাঠারা নিজামের মিত্ররূপে কাজ করে। ঐতিহাসিক ড. হলওয়েলের মতে, ‘ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠাদের এ জোট স্থায়ী হওয়ার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ, তাদের স্বার্থ ছিল পরস্পরবিরোধী।’ ফলে শীঘ্রই নিজাম ও মারাঠা হায়দারের কূটনীতি ও অর্থের প্রলোভনে এ জোট ত্যাগ করে। ফলে ইংরেজরা মিত্রহীন হয়ে পড়ে। ইংরেজরা পুনরায় নিজামকে নিজ আয়ত্তে এনে ব্যাজালোর অভিযুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু হায়দার আলীর অশ্বারোহী বাহিনী ইংরেজ সেনার পাশ কাটিয়ে অতর্কিতভাবে অরক্ষিত মাদ্রাজ শহরের সামনে হাজির হলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের মনোবল ভেঙে যায়। তারা হায়দার আলীর সাথে এক সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়। এ সন্ধির মাধ্যমে উভয় পক্ষ পরস্পরের অধিকৃত স্থান ফেরত দিয়ে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনে। কোম্পানি ও মারাঠাদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় মহীশূর যুদ্ধ হয়।

ঘ উদ্দীপকের সমস্যাটি দ্বারা দ্বিতীয় ইজা-মহীশূর যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। আর এ সমস্যা দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল— আমি এ কথার সাথে পুরোপুরি একমত।

১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করলে হায়দার আলী সন্ধির শর্তানুসারে ইংরেজদের নিকট সামরিক সাহায্য চায়। কিন্তু ইংরেজরা তাকে সাহায্য না করে চুপ করে থাকে। স্বভাবতই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে অধিকতর বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে কৃতসংকল্প হন।

মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসি অধিকৃত মাহে বন্দরটি ইংরেজরা দখল করে নিলে হায়দার আলী ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সৈন্যে অগ্রসর হন। এক বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ তিনি কর্ণাটকে প্রবেশ করে ইংরেজ বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে আর্কট দখল করেন। স্যার আলফ্রেড লয়ালের ভাষায়, ইংরেজদের ভাগ্য বিড়ম্বনা তখন চরমে পৌঁছেছিল। এ শোচনীয় অবস্থায় হেস্টিংস ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষা করতে সচেষ্ট হন।

অবশেষে ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে হায়দার আলী হেস্টিংস কর্তৃক প্রেরিত সেনাধ্যক্ষ আয়ারকুটের হাতে পেটোনোভার যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে হায়দার আলীর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঞ্জোরের নিকট টিপু সুলতানের হাতে ব্রিটিশ সেনাপতি কর্নেল ব্রেইথওয়েট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে টিপু সুলতান ও ইংরেজদের মধ্যে ব্যাজালোরে সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে উভয়পক্ষই পরস্পরের সন্ধিকৃত স্থান প্রত্যর্পণ করতে স্বীকৃত হন। ব্যাজালোরের সন্ধি মনঃপুত না হলেও হেস্টিংস অনুমোদন করতে বাধ্য হন।

পরিশেষে বলা যায় যে, দ্বিতীয় মহীশূর সমস্যাটি ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘসময় স্থায়ী ছিল।

প্রশ্ন ৩ জনাব আকমল তার ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করানোর উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেন। এখানে এসে দেখতে পান ইংরেজি মাধ্যমের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারে। একজন শিক্ষকের কাছে তিনি জানতে পারলেন ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার এবং পাশ্চাত্যের সাথে এই শিক্ষার সমতা বিধান ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের একটি সনদ বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে। একজন শিক্ষানুরাগী লর্ড এখানকার প্রচলিত শিক্ষাবিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তার সময়েই উল্লিখিত সনদটি আরও ২০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করে অনেক নিয়মনীতির পরিবর্তন সাধন করা হয়।

◀ পিখনফল-৪

- ক. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক কে ছিলেন? ১
- খ. সতীদাহ প্রথা কী? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. শিক্ষকের ইংরেজি ভাষা সম্পর্কিত তথ্যটিতে পাঠ্যপুস্তকের যে সংস্কারের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে তা বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. ২০ বছরের জন্য বৃদ্ধি করা আইনটি হলো ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনাত্মক ইতিহাসের পরিবর্তনের আইন— উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক (Lord William Bentinck) ছিলেন ভারত উপমহাদেশে নিযুক্ত একজন শান্তিপ্রিয়, সংস্কারবাদী এবং উদারনৈতিক ব্রিটিশগভর্নর জেনারেল।

খ বহু প্রাচীনকাল থেকে হিন্দু সমাজে প্রচলিত একটি অমানবিক প্রথা হলো সতীদাহ প্রথা।

এ প্রথা অনুযায়ী স্বামী মারা গেলে তার চিতায় জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হতো। সহমরণ (মৃত স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যুবরণ করা) এবং অনুমরণ (বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবাকে একাকী চিতায় পুড়িয়ে মারা) এই দুটি উপায়ে তা কার্যকর করা হতো। রাজা রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের সহযোগিতায় এ অমানবিক প্রথা উচ্ছেদ করেন।

গ শিক্ষকের ইংরেজি ভাষা সম্পর্কিত তথ্যটিতে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের শিক্ষা সংস্কারের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার লর্ড বেন্টিনকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ উপমহাদেশ থেকে সংস্কৃত ও ফারসি ভাষার প্রভাব খর্ব করে পাশ্চাত্য সমাজের ইংরেজি ভাষার প্রচলনে তিনি অসামান্য অবদান

রাখেন। ভারতবাসীর কল্যাণের কথা চিন্তা করে তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন না করলেও কার্যত তার উদ্যোগে ভারতীয়দের কল্যাণই হয়েছিল, যার প্রতিফলন উদ্দীপকেও লক্ষণীয়।

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন লর্ড বেন্টিন্গের হাত ধরেই হয়েছিল। তিনি এদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ-ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার কল্যাণে ব্যবহার না করে ইংরেজি শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন। দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ফারসি বাতিল করে ইংরেজি ভাষাকে গ্রহণ করেন। তিনি কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বেশ কিছু স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, যার সুবিধা এখনো ভারতবাসী ভোগ করছেন।

ঘ ২০ বছরের জন্য বৃন্দিশ করা আইন অর্থাৎ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্গের শাসনামলে প্রণীত ১৮৩৩ সালের চার্টার আইনটি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের পরিবর্তনের আইন- উক্তিটি যৌক্তিক বলে আমি মনে করি।

১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে বাধ্য ছিল। এই অর্থ কেবল সংস্কৃত, ফারসি প্রভৃতি দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় হতো। ইতঃপূর্বে ফারসি ছিল ভারতের দাপ্তরিক ভাষা। বেন্টিন্গের পূর্বে কোন গভর্নর জেনারেলই দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ফারসিকে বাতিল কমরননি। কিন্তু ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে বেন্টিন্গ এই অর্থ ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে বলে ঘোষণা দিলে প্রবল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তদানীন্তন ব্রিটিশসেক্রেটারি এইচ.টি প্রিন্সেপ (Henry Thoby Prinsep) এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক উইলসন প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ ব্যয় করার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। অপর দিকে মেকলে (Thomas Babington Macaulay) এবং রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে আগ্রহী ছিলেন। লর্ড বেন্টিন্গ সকল বাধা উপেক্ষা করে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ৭ মার্চ ইংরেজি শিক্ষার জন্য সরকারি অর্থ ব্যয় হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা বলা যায় যে, ১৮৩৩ সালের চার্টার ছিল শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন আনয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

প্রশ্ন ▶ ৪ রাজা সুশীল কুমার রায় তার রাজ্যের পার্শ্ববর্তী দুর্বল ও পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত রাজ্যগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার করে সুযোগমত দখল করার লক্ষ্যে ঘোষণা করলেন যে, শর্তসাপেক্ষে যেকোনো রাজ্য তার বন্ধুত্ব লাভ করতে পারে। শর্তগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো তার অনুমতি ছাড়া অন্য কোন রাজ্যের সাথে সন্ধি বা যুদ্ধ করা যাবে না। দেশে তার একদল সৈন্য পালন করতে হবে। অন্যদেশের নাগরিকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে হবে। এ শর্তগুলো মেনে নিলে তিনি বন্ধুত্ব গ্রহণকারী দেশের নিরাপত্তা বিধান করবেন। স্বাধীনতা প্রিয় কিছু রাজা এ অপমানকর বন্ধুত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালো। ফলে তাদের সাথে সুশীল রায়ের সংঘর্ষ হয়।

◀ পিখনফল- ৪

ক. কার ফাঁসির জন্য লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে অভিযুক্ত করা হয়? ১

খ. পলাশীর যুদ্ধের চেয়ে বক্সারের যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকের রাজার ঘোষিত নীতির সাথে ইংরেজদের কোন নীতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত নীতির ফলাফল কী হয়েছিল? ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে অভিযুক্ত করা হয়।

খ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমেই উপমহাদেশে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

পলাশীর যুদ্ধে কেবল বাংলার নবাব পরাজিত হন কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব এবং মুঘল সম্রাট সম্মিলিতভাবে পরাজিত হন। এর ফলে রবার্ট ক্লাইভ আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লির সম্রাট কর্তৃক বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দেউয়ানি লাভ করে।

গ উদ্দীপকের রাজার ঘোষিত নীতির সাথে লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ওয়েলেসলি ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে এসে যে কৌশল সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি প্রয়োগ করেন তা ‘অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি’ (Subsidiary Alliance) হিসেবে পরিচিত। ওয়েলেসলি অনুসৃত এ নীতির শর্তানুযায়ী যে সকল দেশীয় রাজ্যের রাজা এ নীতিতে আবদ্ধ হবেন তারা ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে কোন রাজ্যের বিপক্ষের যুদ্ধ ঘোষণা বা আলাপ-আলোচনা করতে পারবে না। চুক্তিভুক্ত শক্তিশালী রাজ্যগুলো তাদের রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখবেন এবং বাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যের একাংশ কোম্পানিকে অর্পণ করবে। তারা নিজস্ব সেনাবাহিনী রাখতে পারবে তবে তা হবে একান্ত ইংরেজ সেনাপতির অধীন। উপর্যুক্ত শর্তাদি পালনের বিনিময়ে ইংরেজ কোম্পানি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ রাজ্যগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। উদ্দীপকে রাজা সুশীল কুমার রায় কর্তৃক তার রাজ্যে অনুসৃত ইংরেজদের কর্তৃক অনুসৃত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির অনুরূপ। যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী চেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

ঘ উক্ত নীতি অর্থাৎ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির ফলাফলে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

প্রথমত, অযোধ্যার সাথে ওয়ারেন হেস্টিংস ও জন শোরের সময়কাল হতেই ইংরেজ কোম্পানির মিত্রতা চুক্তি ছিল। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ওয়েলেসলি এক নতুন চুক্তি করে পূর্বকার মতো বাৎসরিক অর্থগ্রহণের পরিবর্তে রোহিলাখন্ড, গোরক্ষপুর এবং দোয়ার অঞ্চল নিয়ে আসেন। চুক্তিমতো নবাব তার সেনাবাহিনী ভেঙে দিয়ে ইংরেজ বাহিনীর নিরাপত্তা গ্রহণ করে।

দ্বিতীয়ত, হায়দারাবাদের নিজামও ওয়েলেসলির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে নিজের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেন। তিনি ইংরেজ সেনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে তুঙ্গাবদ্রা ও কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ রাজ্যাংশ ইংরেজ কোম্পানিকে ছেড়ে দেন। এভাবে শক্তিশালী নিজামের রাজ্য ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির অধীনে আসে।

তৃতীয়ত, নানা ফড়নবীশের মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে মারাঠাগণ হীনবল হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দেয়। যশোবন্ত সিং হোলকার পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর রাজ্য আক্রমণ করে। যশোবন্ত সিং হোলকারের নিকট পূর্ণার সন্ধিচুক্তি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও পালিয়ে ব্রিটিশদের আশ্রয় গ্রহণ করে ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দে অধীনতামূলক মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন।

চতুর্থত, ওয়েলেসলি মহীশূর রাজ্যের টিপু সুলতানকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণের প্রস্তাব দেন। টিপু সুলতান প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ওয়েলেসলি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে টিপু সুলতান মৃত্যুবরণ করেন এবং মহীশূর রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

এছাড়া ছোট ছোট রাজ্য (কর্নাটক, তাজৌর, সুরাট) রাজ্য সমূহকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণে বাধ্য করেন এবং এভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।

প্রশ্ন ৫: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা অনেক দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রাণকেন্দ্র। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন এখানে প্রায়ই তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ে সমাবেশ করে থাকে। গত ১৩ মার্চ একটি ছাত্র সংগঠনের সভাপতি তার বক্তৃতায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, ওবামা একজন ঘোর-সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তার অধীনতামূলক মিত্রতা এবং অগ্রসরনীতি কোনো পৃথক নীতি নয়। তিনি একই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এই দুটি নীতির প্রয়োগ করে থাকেন। ওবামা বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতি অধীনতামূলক মিত্রতানীতি প্রয়োগ করে আমেরিকার কর্তৃত্ব বৃদ্ধি এবং আমেরিকা মহাদেশের দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোসহ বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি সম্প্রসারণনীতি গ্রহণ করে তার দেশের প্রাধান্য স্থাপন করতে অগ্রসর হন। তিনি বিশ্বকে আমেরিকার শাসনাধীন করতে সারাবিশ্বে কাজ করে যাচ্ছেন।

◀ শিখনফল-৪

- ক. কত খ্রিষ্টাব্দে সিকিম রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়? ১
- খ. ওয়ারেন হেস্টিংসের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২
- গ. বারাক ওবামার সাথে লর্ড ওয়েলেসলির নীতির মিলগুলো বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে করো বারাক ওবামার মতো লর্ড ওয়েলেসলিও বিশ্ব মোড়লে উন্নীত হওয়ার জন্য কাজ করতেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সিকিম রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

খ ভারতবর্ষের ইংরেজ শক্তি সুসংহতকরণে হেস্টিংসের অবদান অনস্বীকার্য।

মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি কলকাতায় কোম্পানির একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ফরাসি ও বাংলা ভাষা ভালো করে জানতেন। পাশাপাশি উর্দু ও আরবিতেও ভালো ছিলেন। নিজ দক্ষতাগুণে কাশিম বাজারের রেসিডেন্ট পদে উন্নীত হন। ১৭৭২-১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার গভর্নর এবং ১৭৭৪-১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গভর্নর জেনারেল হিসেবে শাসন করেন।

গ বারাক ওবামার সাথে লর্ড ওয়েলেসলির নীতির উদ্দেশ্যগত মিল পরিলক্ষিত হয়।

ওয়েলেসলি তার সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে গিয়ে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগ করে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করেন। সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেসলি সুরাটের প্রতি তার লোলুপ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেন। সুরাটের নবাব অপূত্রক অবস্থায় মারা গেলে ওয়েলেসলি তার ভ্রাতার দাবি অস্বীকার করে সুরাট দখল করেন।

ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী নীতির ছোবল থেকে অযোধ্যাও রক্ষা পায়নি। অথচ অযোধ্যা শুরু থেকেই ইংরেজদের মিত্র রাজ্য এবং মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী রাজ্য হিসেবে বিদ্যমান ছিল। ওয়েলেসলি কুশাসনের অজুহাতে এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর পৌত্র জামান শাহের ভারত আক্রমণের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে নিরাপত্তা দৃঢ় করার জন্য অযোধ্যার নবাবকে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী গোরক্ষপুর, রোহিলাখণ্ড এবং দোয়াবের একাংশ কোম্পানিকে ছেড়ে দিতে হয়। ওয়েলেসলির অযোধ্যা নীতি ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক বিবৃপভাবে সমালোচিত হয়েছে।

ঘ আমি মনে করি, বারাক ওবামার মতো লর্ড ওয়েলেসলিও বিশ্ব মোড়লে উন্নীত হওয়ার জন্যে কাজ করতেন।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে লর্ড ওয়েলেসলি কোম্পানির শাসনভার গ্রহণ করেন। লর্ড ওয়েলেসলি যখন ভারতে আগমন করেন তখন এদেশে নিজাম, মারাঠা ও টিপু তিনটি শক্তি খুবই প্রবল ছিল। অন্যদিকে নেপোলিয়নের ভারত বিজয়ের হুমকি এবং জামান শাহের দিল্লি আক্রমণের পরিকল্পনা ব্রিটিশ শক্তিকে ভীতিবিস্মল করে তোলে। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ওয়েলেসলি দমবার পাত্র ছিলেন না।

খর্দার যুদ্ধে পরাজিত নিজাম-মারাঠা আক্রমণের জয় মিত্রলাভে ব্যস্ত হয়ে পড়লে সুকৌশলী ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতানীতি প্রয়োগ করে নিজামকে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ করেন। তিনি মহীশূরের টিপু সুলতানকে পরাজিত এবং নিহত করে মহীশূর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অতঃপর তিনি মারাঠা শক্তি সংঘের ধ্বংস সাধন করে সিন্ধিয়া, ভোঁসলা এবং হোলকারকে ইংরেজদের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলেন। লর্ড ওয়েলেসলি সম্প্রসারণনীতি অনুসরণ করে দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন এবং ঐ সমস্ত রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ শাসনাধীন করে সেখান থেকে ফরাসি প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট করেন। ছলে-বলে-কৌশলে ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সর্বাঙ্গক করাই ছিল তার সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূল লক্ষ্য।

সাম্রাজ্য বিস্তার ছাড়াও ওয়েলেসলি দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। তিনি ইউরোপীয়দের জন্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায় যে, বারাক ওবামার মতো লর্ড ওয়েলেসলি বিশ্ব মোড়লে উন্নীত হবার জন্যে কাজ করতেন।

প্রশ্ন ▶ ৬ পূর্বকান্দি গ্রামের হিন্দু সমাজে এখনো একটি নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত আছে। এখানে স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর বিষপানে আত্মহত্যা করার নিয়ম রয়েছে। পরে স্বামী ও স্ত্রীকে এক চিতায় পোড়ানো হয়। প্রদীপ শহর থেকে লেখাপড়া শেষ করে গ্রামে এসে এ নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এলাকাবাসীকে সচেতন করেন। বিভিন্ন মিডিয়ায় বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এতে বিষয়টি সরকারের দৃষ্টিতে এলে সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করে।

◀ শিখনফল-৫

- ক. ‘তুহফাত-উল-মুওয়াহিদ্দীন’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
খ. কীভাবে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রদীপের কর্মকাণ্ড তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন নেতার আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা করো।
ঘ. উক্ত নেতার কর্মকাণ্ড কি শুধু উক্ত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ‘তুহফাত-উল-মুওয়াহিদ্দীন’ গ্রন্থটি রচনা করেন রাজা রামমোহন রায়।

খ বাংলার অধিকার সচেতন ও শিক্ষিত শ্রেণির প্রচেষ্টায় বাংলায় নবজাগরণ ঘটে।

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে বাংলার মানুষ ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত। শিক্ষা, চাকরিসহ সকলক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে এদেশীয় জনগোষ্ঠী অত্যন্ত মানবতর জীবনযাপন করতে থাকলে এদেশের কিছু শিক্ষিত শ্রেণির মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়াব আবদুল লতিফ এদের মধ্যে অন্যতম। এদের ইতিবাচক ভূমিকার কারণেই এদেশে নবজাগরণ ঘটে।

গ উদ্দীপকের উল্লিখিত প্রদীপের কর্মকাণ্ডের সাথে আমার পাঠ্য বইয়ে বর্ণিত রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

সমাজ থেকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার দূরীকরণে যারা অবদান রেখে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় অন্যতম। তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত সতীদাহ প্রথা দূরীকরণে তিনি অনবদ্য ভূমিকা পালন করেন, যার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকের প্রদীপের কর্মকাণ্ডের মধ্যে।

তখনকার সমাজে হিন্দু নারীদের স্বামীর মৃত্যুর পর একই চিতায় পুড়িয়ে মারার প্রথা প্রচলিত ছিল। এ অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথাকেই বলা হয় সতীদাহ প্রথা। এ প্রথা সমাজে হিন্দু বিধবা নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু নারীদের এ করুন পরিণতি মেনে নিতে না পেরে এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। এর বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করে তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারকে এ প্রথা বন্ধে উদ্যোগ নিতে বাধ্য করেন। তার একান্ত সহযোগিতায় তৎকালীন ব্রিটিশ গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ আইন পাস করেন। ১৮২৯ সালে এ আইনটি প্রণয়নের পর সমাজ থেকে এ অমানবিক প্রথা দূরীভূত হয়।

উদ্দীপকের প্রদীপ সমাজ থেকে সতীদাহ প্রথার মতো জঘন্য কর্মকাণ্ড দূরীকরণে এলাকাবাসীকে সচেতন করে তোলেন। তাই প্রদীপ যেন রাজা রামমোহন রায়েরই যোগ্য উত্তরসূরি।

ঘ উক্ত নেতা তথা রাজা রামমোহন রায়ের কর্মকাণ্ড শুধু সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না বলে আমি মনে করি।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের একজন আধুনিক পুরুষ। অধিকার বঞ্চিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজকে অধিকারসচেতন করতে তিনি ধর্মীয় ও সামাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে ভারতীয় সমাজকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তার সংস্কারধর্মী কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য।

তিনি আঠারো শতকের ভারতের গতানুগতিক সনাতনী শিক্ষা লাভ করেন। তিনি হিন্দি ও মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া বেশ কয়েকটি প্রাচ্য ভাষা যেমন- সংস্কৃত, আরবি ও ফারসিতে উল্লেখযোগ্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহ ভালোভাবে আয়ত্ত্ব করেন এবং মুসলমান পণ্ডিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের রাজস্ব ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি ইসলাম ধর্মতত্ত্ব ও আইনশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন।

রাজা রামমোহন রায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিন্দু সমাজে প্রচলিত বহু দেবদেবীর আরাধনাকে অপছন্দ করতেন। এ কারণে নিজের একেশ্বরবাদী ধর্মমত প্রচারের জন্য ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা (পরবর্তীতে ব্রাহ্মসমাজ) প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া আত্মীয় সভা (বন্ধুদের সমিতি) নামক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সন্তাব গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এভাবে তিনি ভারতীয় অন্ধকার সমাজকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য সর্বাঙ্গক প্রচেষ্টা চালান।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, শুধু কুসংস্কার দূরীকরণ নয়, সমাজ সংস্কারেও রাজা রামমোহন রায় অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন ▶ ৭ কথায় আছে পিতা গুণে পুত্রি, এমনি এক সাহসী পিতার পুত্র ছিলেন আরবাজ। তিনি তার দেশে অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদী নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। রাজধানীতে স্বাধীনতাবৃক্ষ নামক গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে স্বাধীনচেতা মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটান আরবাজ। নিজেই দুটি জাহাজের মডেল তৈরি করেন যা নৌবাহিনীর জন্য নির্মিত হয়েছিল। ক্রমেই তিনি বিদেশি শক্তির শত্রুতে পরিণত হন।

◀ শিখনফল-৫

- ক. পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন কে? ১
খ. হেস্টিংসের পররাষ্ট্রনীতি আলোচনা করো। ২
গ. আরবাজের সাথে ভারতবর্ষের যে মহানায়কের মিল রয়েছে তার পরিচয় প্রদান করো। ৩
ঘ. এই ধরনের একজন মহানায়কের সাথেই তৃতীয় ইংল-মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল—মূল্যায়ন করো। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

খ হেস্টিংস গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়ে সর্বপ্রথম পররাষ্ট্র ও সীমান্ত নীতি বিষয়ে কিছু পরিবর্তন সাধন করেন।

তিনি লক্ষ করেন যে কোম্পানি ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে পড়েছে। সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজদের অধিকার স্থায়ী করতে দেশীয় রাজাদের যথাসম্ভব ইংরেজ সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল করে তোলার জন্য অধীনতামূলক মিত্রতানীতি সূচনা করেন।

গ আরবাজের সাথে ভারতবর্ষের যে মহানায়কের মিল রয়েছে তিনি হলেন ‘মহীশূরের বাঘ’ নামে খ্যাত টিপু সুলতান।

মহীশূরের সমরনায়ক ও অধিপতি হায়দার আলীর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান। তিনি ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ১০ নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তার আসল নাম ফতেহ আলী খান। স্থানীয় সাধক টিপু মাস্তানের নামানুসারে তাকে টিপু ডাকা হতো। ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধে তিনি পিতার মতো আমৃত্যু সংগ্রাম করে দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ভারতের ইতিহাসে টিপু সুলতান তার ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের জন্য এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান দখল করে আছেন। টিপু ছিলেন শিক্ষিত, ধর্মভীরু ও সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী এক স্বাধীনচেতা সুলতান। ফারসি, উর্দু ও কানাড়ি ভাষায় তার দখল ছিল।

১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয় ‘ইজা-মহীশূর’ যুদ্ধ চলাকালে তার পিতা হায়দার আলীর আকস্মিক মৃত্যু হলে তিনি মহীশূরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতার মতোই তিনি উপলব্ধি করেন, ভারতবর্ষের সকল শক্তির সাধারণ শত্রু হলো ইংরেজ শক্তি। এ শক্তিকে বুঝতে না পারলে ভারতবাসীর সার্বভৌমত্ব বলে কিছু থাকবে না। এজন্য তিনি ক্রমবর্ধমান ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অসীম সাহসের সাথে অস্ত্র ধারণ করেন।

ইংরেজদের নেতৃত্বে মিত্রবাহিনী প্রায় এক মাস টিপু সুলতানকে রাজধানীতে অবরুদ্ধ করে রাখে। বীরের মতো যুদ্ধ করে ব্রিটিশ বিরোধী অকুতোভয় সৈনিক ১৭৯৯সালে ৪ মে শত্রু সেনার গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

ঘ টিপু সুলতানের সাথেই তৃতীয় ইজা-মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ১৭৯০-১৭৯২ সালে।

দ্বিতীয় ইজা-মহীশূর যুদ্ধের সময় টিপুর পিতার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ইংরেজরা হায়দার আলী ও টিপুর হাতে পর্যুদস্ত হলে তখন তারা বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে চায় টিপুর সাথে। ম্যাজালোর চুক্তি অনুযায়ী দু’পক্ষের মধ্যে বৈরিতার আপাত অবসান হয়েছিল সত্য কিন্তু ইজা-মহীশূর বিরোধিতার কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি। টিপু ও ইংরেজ উভয়ই বুঝেছিলেন যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।

এদিকে আঠার শতকের আশির দশকে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে টিপু ইংরেজ সমর্থক ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করে তৃতীয় ইজা-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা করেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মাদ্রাজে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করলে সম্ভবত ভয়ে তারা অগ্রসর হয়নি। ফলে লর্ড কর্নওয়ালিস মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষের তীব্র নিন্দা করেন এবং দাক্ষিণাত্যের টিপুর প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা এবং নিজামের সাথে ত্রিশক্তি মৈত্রী গঠন করেন। নিজে সেনাপতি হিসেবে কর্নওয়ালিস যুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে ভয়ংকর যুদ্ধ হলো এবং কোনো পক্ষই জয়লাভ করতে সমর্থ হয়নি। শেষ পর্যন্ত টিপু পরাজিত হয়ে ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গপট্টম-এর চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

আলোচনা শেষে বলা যায় যে, মহানায়ক টিপু সুলতানের সাথেই তৃতীয় ইজা-মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

প্রশ্ন ▶ ৮ রাশেদ সাহেব কমলগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে সেখানকার উন্নতির জন্য অনেক কল্যাণমূলক সংস্কার প্রবর্তন করেন। বিশেষ করে তিনি উপজেলাটির সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমন ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজের জন্য কঠোর

ব্যবস্থা নেন। তার চেষ্টায় কমলগঞ্জে শান্তি ফিরে আসে এবং সমাজে নারীদের ওপর কুসংস্কারমূলক অত্যাচারের মাত্রা কমে আসে।

◀ পিখনক্ষণ: ৬

- ক. পেশোয়া কী? ১
- খ. অধীনতামূলক মিত্রতানীতি ব্যাখ্যা করে লিখ? ২
- গ. উদ্দীপকের রাশেদ সাহেবের সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের যে ইংরেজ শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে— তার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের বর্ণনা দাও। ৩
- ঘ. আলোচ্য শাসকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল তার সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা-উক্তিটির মূল্যায়ন কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পেশোয়া হলো রাজবংশের নাম।

খ লর্ড ওয়েলেসলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারে যে কৌশল নীতি অনুসরণ করেন তা-ই ইতিহাসে ‘অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি’ হিসেবে পরিচিত।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ভারতে যে আঞ্চলিক সার্বভৌম শক্তিগুলোর উত্থান হয় তাদের সাথে ইংরেজ শক্তির ‘সার্বভৌম ক্ষমতার’ প্রশ্নে তিনি এ নীতি অনুসরণ করেন। এ নীতির মাধ্যমে সামরিক, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক-যে কোনো সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ইংরেজ কোম্পানির কর্তৃত্ব ছিল চূড়ান্ত। একবার এ নীতির বন্ধনে আবদ্ধ হলে আর বের হওয়া যায় না।

গ উদ্দীপকের কমলগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান রাশেদ সাহেবের সাথে আমার পাঠ্যবইয়ের যে ইংরেজ শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে তিনি হলেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক।

ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন বেন্টিনকের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়গুলো লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের শিক্ষা সংস্কার অন্যান্য সংস্কার থেকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ১৮১৩ সালের সনদ অনুযায়ী ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য বার্ষিক এক লক্ষ রুপি বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু এই অর্থ ভারতীয় ভাষা (সংস্কৃত, আরবি ও ফার্সি) শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে না ইংরেজি ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয় হবে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। দীর্ঘ বিতর্কের পর অবশেষে লর্ড বেন্টিনক সকল বাধা উপেক্ষা করে ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ ইংরেজি শিক্ষার জন্য এই অর্থ ব্যয় হবে বলে ঘোষণা করেন। একই বছরে তিনি কলকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাইয়ে এলফিনস্টোন ইনস্টিটিউট নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শিক্ষা সংস্কারে লর্ড বেন্টিনক ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব।

ঘ উদ্দীপকে আলোচ্য শাসক অর্থাৎ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল তার সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা— উক্তিটি যথার্থ।

ভারতবর্ষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সাম্রাজ্য বিস্তারের চেয়ে কল্যাণমূলক সংস্কার কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।

লর্ড বেন্টিনক ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন তার সমাজ সংস্কারের জন্য। সতীদাহ প্রথার বিলোপ ও ঠগী দমন হলো বেন্টিনকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি। প্রাচীনকাল থেকে এ

দেশের হিন্দু সমাজে ‘সহমরণ’ (মৃত স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় একই চিতায় স্ত্রীর মৃত্যুবরণ করা) এবং ‘অনুমরণ’ (বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবাকে একাকী চিতায় পুড়িয়ে মারা) প্রথার প্রচলন ছিল। সামাজিকতা রক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন বিধবাকে অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোরপূর্বক চিতায় পুড়িয়ে মারত।

লর্ড কর্নওয়ালিস ও তার পরের অনেক গভর্নর জেনারেলই এ আমানবিক প্রথাকে বন্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এদেশীয় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে বলে তারা শেষ পর্যন্ত ততটা আগ্রহ দেখাননি। ভারতবর্ষের কয়েকজন উদারপন্থি সংস্কারক বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থন ও সহায়তা লাভ করেন লর্ড বেন্টিংক। ১৮২৯ সালে সদর নিয়ামত আদালতের বিচারকদের সমর্থন নিয়ে এক আদেশবলে এ আমানবিক প্রথা রহিত করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, লর্ড বেন্টিংকের সকল সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার সামাজিক সংস্কার ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ৯ জনাব কামরুজ্জামান একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি তার এলাকায় অনেক প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্তন সাধন করেন। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যুর পর তার চিতায় স্ত্রীকে একত্রে পুড়িয়ে মারার যে রীতি প্রচলিত ছিল তার বিলোপ সাধন করেন। এছাড়াও এক শ্রেণির দস্যুদের কঠোর হস্তে দমন করে জনমনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

◀ **শিখনফল: ৬**

- ক. লর্ড বেন্টিংক কার ওপর ঠগীদের দমনের ভার দেন? ১
- খ. হেস্টিংসের অযোধ্যা নীতিটি বর্ণনা কর। ২
- গ. কামরুজ্জামান সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের যে ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের কাজগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের এখন লর্ড স্মরণীয় হয়ে আছেন? মতামতের স্বপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কর্নেল স্লিম্যান (Colonel Sleeman)-এর ওপর ঠগী দমনের দায়িত্ব দেন।

খ হেস্টিংসের অযোধ্যা নীতিটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির নীতি।

হেস্টিংস উপার্জন বৃদ্ধির জন্য ইংরেজদের শত্রু মারাঠাদের আশ্রয়ে বাস করার অজুহাতে সম্রাট শাহ আলমকে দেয় বার্ষিক ২৬ লাখ টাকা বন্ধ করে দেন এবং সম্রাটের নিকট হতে বারানসির সন্ধি দ্বারা এলাহাবাদ ও কারা জেলা দুটি অযোধ্যার নবাবকে ৫০ লাখ টাকার বিনিময়ে প্রদান করেন। হেস্টিংস অযোধ্যার শক্তি বৃদ্ধি করে একে মারাঠা ও ইংরেজদের মধ্যে শক্তিশালী মধ্যবর্তী রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। আর এটাই ছিল তার অযোধ্যা নীতির মূল উদ্দেশ্য।

গ কামরুজ্জামান সাহেবের কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের সমাজ সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ভারতবর্ষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক মাদ্রাজ কাউন্সিলের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হয়ে আগমন করলেও ভেলোরের সিপাহি বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ তাকে ইংল্যান্ডে ফিরিয়ে নেন। পরবর্তীতে ১৮২৮ সালে আবার বেন্টিংককে গভর্নর জেনারেল করে পাঠানো হয়। তিনি প্রাচীনকাল থেকে ভারতের হিন্দু সমাজে চলে আসা নানা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ‘সহমরণ’ ও ‘অনুমরণ’ প্রথার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের কয়েকজন উদারপন্থি সংস্কারক বিশেষ করে রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমর্থন ও সহায়তা লাভের মাধ্যমে তিনি ১৮২৯ সালে এ আমানবিক প্রথা বাতিল করেন। এ ছাড়াও তৎকালীন হিন্দু সমাজের প্রথম সন্তানকে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ ও বিবাহ দিতে অক্ষম এমন পিতার কন্যাকে গলা টিপে হত্যা করার মতো ঘৃণ্য প্রথা তিনি রহিত করেন। এছাড়া তৎকালীন ভারতীয় সমাজে ঠগীরা হঠাৎ করে ছদ্মবেশে এসে নিরীহ পথিক, তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে তাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যেত। বেন্টিংক এদের দমন করেন।

সূতরাং বলা যায় যে, কামরুজ্জামানের কর্মকাণ্ডের সাথে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারমূলক কাজগুলোর মাধ্যমে একজন লর্ড ভারতীয় উপমহাদেশে স্মরণীয় হয়ে হয়ে আছেন। তিনি হলেন লর্ড বেন্টিংক। লর্ড বেন্টিংকের সংস্কারমূলক কাজের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ হলো সামাজিক সংস্কার।

লর্ড বেন্টিংক ভারতীয় সমাজব্যবস্থা থেকে জঘন্য সতীদাহ প্রথা বিলোপ করে ইতিহাসে স্মরণীয় আছেন। বহুকাল থেকেই হিন্দু সমাজে ‘সহমরণ’ ও ‘অনুমরণ’ প্রথার প্রচলন ছিল। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা লোকাচার রক্ষার জন্যে বিধবা স্ত্রীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুড়িয়ে মারত। এ আমানবিক প্রথায় ব্যথিত হয়ে বেন্টিংক ১৮২৯ সালে এটা বিলোপ করেন।

তৎকালীন হিন্দু রীতি অনুযায়ী দেবতার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রথম সন্তানকে গঙ্গায় নিক্ষেপ এবং কন্যাদায় গ্রন্থ পিতার কন্যা সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করার নিয়মও তিনি চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

ঠগীদমন বেন্টিংকের আর একটি উল্লেখযোগ্য সমাজ সংস্কার। মুঘলদের পতনের যুগে ঠগী নামে একদল দস্যু ভারতের সর্বত্র ত্রাস সৃষ্টি করে। এরা ছদ্মবেশে তীর্থযাত্রী ও পথিকদের অনুসরণ করত এবং সুযোগ পেলেই তাদের গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে সর্বস্ব লুট করত। লর্ড বেন্টিংক ঠগী দমন করার জন্যে কর্নেল স্লিম্যান (Sleeman)-এর ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। স্লিম্যান ঠগীদের কঠোর হস্তে দমন করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে লর্ড বেন্টিংক স্মরণীয় হয়ে আছেন।

প্রশ্ন ১০ সূর্যচরণ ছিলেন ‘ক’ নামক বিশাল সাম্রাজ্যের এক অংশের রাজা। তিনি অপূত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য ‘ক’ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তার পালিত পুত্র রাজ্যের দাবি করে ব্যর্থ হয়। ফলে ‘ক’ সাম্রাজ্য ক্রমাগত বিস্তৃত হতে থাকে।

◀ **শিখনফল: ৭**

- ক. ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় কত সালে? ১
- খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? ২

- গ. উদ্দীপকটি লর্ড ডালহৌসির কোন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত নীতির ফলাফল বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হয় ১৮৫৭ সালে।

খ ফরায়েজি আন্দোলন হচ্ছে হাজি শরীয়তউল্লাহ কর্তৃক পরিচালিত একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন।

১৮১৮ সালে মক্কা হতে স্বদেশে ফিরে তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থা দেখে সামাজিক অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। ক্রমেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জমিদার, নীলকর ও মহাজনদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন থেকে সর্বহারা কৃষক সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য তিনি এক আন্দোলন পরিচালনা করেন। যা ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

গ উদ্দীপকটি লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বত্ববিলোপ নীতির মূলকথা হলো- ব্রিটিশ অধীন বা ব্রিটিশ শক্তি দ্বারা সৃষ্ট কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজবংশের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে সেই রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়বে। কোনো দত্তকপুত্রকে এসব রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না। লর্ড ডালহৌসি তার স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে ১৮৪৮ সালে সাতারা রাজ্য, ১৮৫০ সালে সম্বলপুর রাজ্য, ১৮৫৩ সালে নাগপুর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এছাড়া ১৮৫৩ সালে স্বত্ববিলোপ নীতির মাধ্যমেই তিনি বাসীর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অনুরূপভাবে আরো কিছু রাজ্য যেমন- ভগৎ রাজ্য, উদয়পুর, রাজস্থানের করৌলি প্রভৃতি রাজ্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হয়। উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘ক’ নামক সাম্রাজ্যের এক অংশের রাজা সূর্যচরণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য ‘ক’ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। তার পালিত পুত্র রাজ্যের দাবি করে ব্যর্থ হয়। উল্লিখিত এ ঘটনার সাথে লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত নীতি মূলত লর্ড ডালহৌসির স্বত্ববিলোপ নীতির প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

স্বত্ববিলোপ নীতির মূলকথা হলো- ব্রিটিশ অধীন বা ব্রিটিশ শক্তির দ্বারা সৃষ্ট কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজবংশের কোনো উত্তরাধিকারী না থাকলে সেই রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়বে। কোনো দত্তকপুত্রকে এসব রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না। লর্ড ডালহৌসি এ নীতির ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন।

স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের ফলে ১৮৪৮ সালে সাতারা রাজ্যের রাজা মারা গেলে তার দত্তকপুত্রের দাবি অস্বীকার করে ডালহৌসি রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ক্রমান্বয়ে ১৮৫০ সালে সম্বলপুর, ১৮৫৩ সালে নাগপুর এবং বাসী রাজ্যও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। শতদু নদীর নিকট ভগৎ রাজ্য, মধ্যপ্রদেশে উদয়পুর, রাজস্থানের করৌলি প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আরো বিস্তৃত হয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় সূর্যচরণ অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তার রাজ্য ‘ক’ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। যার ফলে ‘ক’ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। যা স্বত্ববিলোপ নীতির অনুরূপ। তাই বলা যায় দেশীয়দের অসন্তোষ সত্ত্বেও এ নীতি প্রয়োগ করা হয় এবং এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে।

প্রশ্ন ১১ গণি মিয়া একজন আদর্শ কৃষক। চার বিঘা জমি চাষাবাদ করে কোনো রকমে সংসার চালায়। বিদেশে এক সংস্থার প্রলোভনে স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কৃষকদের দ্বারা সূর্যমুখী ফুলের চাষের প্রকল্প গ্রহণ করেন। তিনি গণি মিয়াকে ডেকে বললেন, তোমার যে চার বিঘা জমি রয়েছে তার মধ্যে থেকে উর্বর দুই বিঘা জমিতে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করতে হবে। এর আগে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করে অনেক কৃষক পথে বসেছে। তাদের খরচের টাকাও ওঠেনি। তাই গণি মিয়া সূর্যমুখী চাষ করতে অনিচ্ছা জানায়। চেয়ারম্যান তেলে-বেগুনে জলে ওঠে বলে, সূর্যমুখী ফুলের চাষ বাধ্যতামূলক। পর্যায়ক্রমে সবাইকে এ চাষ করতে হবে। একদিন কৃষকরা সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ঘেরাও করে। চেয়ারম্যান উপায় না পেয়ে সূর্যমুখী চাষ কৃষকদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিলেন।

◀ পিখনফল-৮

ক. ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন?

খ. এনফিল্ড রাইফেল বলতে কী বোঝায়?

গ. সূর্যমুখী ফুলের চাষের ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের এমন কোন চাষের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সূর্যমুখী ফুলের চাষ বাধ্যতামূলক করায় চাষিরা ইউনিয়ন পরিষদ ঘেরাও করে—বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড ক্যানিং।

খ এনফিল্ড রাইফেল এক ধরনের বিশেষ বন্দুক। এই বন্দুকের গুলি বা টোটা দাঁত দিয়ে ছিড়ে বন্দুকে ভরতে হতো।

কার্তুজটিকে পিচ্ছিল রাখার জন্য এতে তথাকথিত গরু ও শূকরের মিশ্রিত চর্বি ব্যবহার করা হতো। যা মুসলমান এবং হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানে। ফলে মজল পাণ্ডে ব্যারাকপুরের এক সিপাহি বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং এ বিদ্রোহ ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যা ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ নামে পরিচিত।

গ সূর্যমুখী ফুলের চাষের ঘটনার সাথে পাঠ্যবইয়ের নীলচাষের মিল পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপে নীলের চাহিদা বেড়ে যায়। অন্যদিকে আমেরিকার উপনিবেশগুলো স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর ইংরেজ বণিকদের সেখানকার নীলের ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। এ দু'কারণে ইংরেজরা বাংলাদেশকে নীলচাষের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেয়। কোম্পানি শাসনামলে নীলকরণ প্রজাদের ওপর জোর জবরদস্তি করে সর্বোৎকৃষ্ট জমিতে নীলচাষে বাধ্য করত এবং নীলচাষের খরচ বিবেচনা না করে বেধে দেওয়া দামে তা বিক্রি করতে হতো। কোনো কৃষক নীলচাষে অনিচ্ছুক হলে তার ওপর চলত অমানবিক নির্যাতন। নীলচাষের ফলে অনেক কৃষক পথে বসে। পরবর্তীতে নীলচাষিরা নীলকরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ এরূপ প্রবল আকার ধারণ করলে, সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। হাজার হাজার নীলচাষিদের আন্দোলনের মুখে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে নীলচাষ সংক্রান্ত নীল কমিশন গঠন করা হয়। নীল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকার নীলচাষ কৃষকদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন বলে আদেশ জারী করে।

উদ্দীপকেও দেখা যায়, বিদেশে এক সংস্থার প্রলোভনে স্থানীয় ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কৃষকদের দ্বারা সূর্যমুখী ফুলের চাষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং গণি মিয়াকে তার চার বিঘার জমির মধ্যে উর্বর দুই বিঘা জমিতে সূর্যমুখী ফুলচাষ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু সূর্যমুখী ফুলচাষ লাভজনক না হওয়ায় গণি মিয়া তা চাষ করতে অনিচ্ছা জানালে চেয়ারম্যান তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে; বলে, সূর্যমুখী ফুলের চাষ বাধ্যতামূলক। একদিন কৃষকরা সংগঠিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ঘেরাও করে এবং চেয়ারম্যান উপায় না দেখে সূর্যমুখী চাষ কৃষকদের ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেন। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সূর্যমুখী চাষের ঘটনা নীলচাষের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঘ সূর্যমুখী ফুলের চাষ বাধ্যতামূলক করায় চাষিরা ইউনিয়ন পরিষদ ঘেরাও করে অর্থাৎ নীলচাষ বাধ্যতামূলক করায় নীলচাষিরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

উনিশ শতকের নীল বিদ্রোহ বাংলার ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত নীল বিদ্রোহ বাংলার কৃষক সম্প্রদায়কে ইংরেজবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে নীলের চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়া বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজরা নীলচাষের প্রচলন করে। নীলচাষ অলাভজনক হওয়ায় কৃষকরা নীলচাষে মোটেই আগ্রহী ছিল না। কৃষকদের নীলচাষে অনীহা থাকায় ইংরেজরা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ফলে তারা নানারকম উৎপীড়নের মাধ্যমে কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করে। কোনো কৃষক নীলচাষে অনিচ্ছুক হলে তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে নীলকরদের বিরুদ্ধে নীলচাষিরা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে যশোর, পাবনা, রাজশাহী ও রংপুরের কৃষকরা একতাবদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেন কোনো অবস্থায় তারা আর নীলচাষ করবে না। অবস্থা বুঝে ছোট লাট জন স্যার পিটার গ্রান্ট ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে কৃষককে দণ্ড প্রদানের এক আইন পাস করেন এবং ঐ আইনের দোহাই দিয়ে নীলকররা ত্রাসের রাজত্ব কায়ম করে। নীলকরদের বিরুদ্ধে নদীয়া জেলার ২৭টি গ্রামের কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। হাজার হাজার নীলচাষিদের আন্দোলনের চাপে সরকার নীলচাষ ইচ্ছাধীন বলে আদেশ জারী করেন।

উপমহাদেশে নীল বিদ্রোহ ছিল একটি সফল আন্দোলন। নীল বিদ্রোহের মাধ্যমেই ইংরেজ সরকার এ দেশীয়দের কাছে প্রথম মাথানত করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন ১২ উদয়ন গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলো ফড়িয়া মধ্যস্বত্বভোগী ও দাদন ব্যবসায়ীদের অত্যাচারের শিকার। ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই মানুষেরা ধর্মের অবশ্য পালনীয় কাজগুলোর পরিবর্তে ঝাড়ফুক, মানত, পিরপূজা, কবরপূজা, জন্মউৎসব ও মহরম পালন এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে বেশি উৎসাহী। গ্রামের আদর্শবান যুবক সালমান গ্রামবাসীকে এ ধরনের কর্মকাণ্ড হতে বিরত থেকে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধেও সোচ্চার করে তোলেন।

◀ শিখনফল: ৮

ক. বাঁশের কেলা কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

১

খ. স্বত্ববিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়?

২

- গ. সালমানের আহবানে ভারতে সংঘটিত কোন আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে? আলোচনা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের মতো পাঠ্যপুস্তকের আন্দোলনটিও ধর্মীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না— মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঁশের কেলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সৈয়দ মীর নিসার আলী (তিতুমীর)।

খ ব্রিটিশ শক্তির ওপর নির্ভরশীল দেশীয় রাজ্যগুলো কৃষ্টিগত করার জন্য যে নতুন নীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল তাই স্বত্ববিলোপ নীতি।

এ নীতির মূলকথা হলো- ব্রিটিশদের অধীন কিংবা ব্রিটিশ শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা কোনো উত্তরাধিকারী না রেখে মৃত্যুবরণ করলে সে রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবে। কোনো পালিত পুত্রকে এসব রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না।

লর্ড ডালহৌসি ঘোষণা করছিলেন যে, কেবল আশ্রিত বা নির্ভরশীল (protected) বা (Dependent States) হিন্দু রাজ্যগুলোর ওপরই স্বত্ববিলোপ নীতি প্রযুক্ত হবে। এ নীতির প্রয়োগের ফলে সাতারা, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

গ সালমানের আহবানে ভারতের ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিফলন ঘটেছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত ধর্মভীরু ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য গ্রামের আদর্শবান যুবকের কর্মকাণ্ড হাজী শরীয়াতুল্লাহর ফরায়েজি আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফরায়েজি কথাটি ‘ফরজ’ শব্দ থেকে এসেছে। ইসলামে ‘ফরজ’ শব্দটির অর্থ ‘যা অবশ্য কর্তব্য’। মূলত ‘ফরজ’ শব্দ থেকেই ফরায়েজি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। হাজী শরীয়াতুল্লাহ ছিলেন এ আন্দোলনের প্রবর্তক। তিনি বহুদিন যাবৎ মক্কা ও মিসরের কায়রোতে অবস্থান করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে লক্ষ করেন যে, মুসলিম সমাজে এমন কিছু আচার-বিশ্বাস প্রবেশ করেছে যা ইসলামের মূল চেতনার পরিপন্থী। এজন্য তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রচলিত মুসলিম রীতি নীতিকে কুরআন এবং হাদিসের আলোকে বিশুদ্ধতা দান করার জন্য এক সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তার পরিচালিত এ আন্দোলনই ‘ফরায়েজি আন্দোলন’ নামে পরিচিত। তিনি মনে করতেন, যেহেতু ভারতবর্ষ বিধর্মীদের দখলে তাই এটি ‘দার-উল-হারব’ বা শত্রুদের দেশ। এজন্য এখানে জুমার নামাজ ও দুই ঈদের জামাত পড়া উচিত নয়। তিনি সর্বত্র এই মতবাদ প্রচার করেন যে, জমি আল্লাহর দান। সুতরাং জমিদারের কর ধার্য করার অধিকার নেই। তিনি অতীত অপরাধের জন্য ‘অনুতাপ করা’ এবং ভবিষ্যতে সুখ-শান্তির জন্য পবিত্র আচারণের ওপর গুরুত্ব দেন। তিনি ইসলাম পরিপন্থী সব বিশ্বাস-আচার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে যা অবশ্য করণীয় তা পালন করার জন্য জোর দেন। তিনি পিরপূজা, কবর পূজা, জন্ম উৎসব, মহরম পালন প্রভৃতি বর্জন করার আহ্বান জানান।

ঘ উদ্দীপকের মত পাঠ্যপুস্তকের ফরায়েজি আন্দোলনটিও ধর্মীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না বলে আমি মনে করি।

হাজি শরীয়তুল্লাহর আস্থানে পূর্ব বাংলার দরিদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের মাঝে এক নতুন উদ্ভীপনার সৃষ্টি হয়। তিনি ফতোয়া দেন যে কৃষকরাই জমির প্রকৃত মালিক; জমিদারদের এতে কোনো অধিকার নেই। প্রাচীন পন্থি জমিদারগণ শরীয়তুল্লাহর বিরোধিতা করে। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র দুদু মিয়া এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দুদু মিয়া অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের মোকাবিলায় একটি শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। দুদু মিয়ার আস্থানে কৃষকেরা জমিদারদের খাজনা দেয়া বন্ধ করলে হিন্দু জমিদাররা রায়তদের (প্রজাদের) ওপর অত্যাচার শুরু করে। দুদু মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনী তাদের প্রতিরোধ করে। দুদু মিয়াকে দমন করার জন্য জমিদারগণ নীলকরদের যোগসাজশে ফৌজদারি আদালতে অনেক মামলা দায়ের করে। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাকে দমন করতে তারা ব্যর্থ হয়। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময় তাকে রাজবন্দি হিসেবে বন্দি করে রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি ঢাকার বংশাল রোডে কিছুকাল বসবাস করেন। এখানেই অসুস্থ হয়ে ১৮৬২ সালে তিনি মারা গেলে ফরায়েজি আন্দোলন নেতৃত্বের অভাবে থেমে যায়।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যায়, ফরায়েজি আন্দোলনটি ধর্মীয় গভিতে সীমাবদ্ধ ছিল না-উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ১৩ আব্দুল ছাত্তার মহাস্থানগড়ে বেড়াতে গিয়ে তার মনে পড়ে যায় এমন একটি সম্প্রদায়ের কথা যারা বিভিন্ন দরগাহ ও তীর্থস্থানগুলোতে দল বেধে ঘুরে বেড়াতো। তাদের এ কর্মকাণ্ডে ব্রিটিশরা বাধা প্রদান করলে তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহ পরবর্তী বিভিন্ন সংগ্রামের পটভূমি প্রস্তুতে বিশেষ অবদান রাখে।

◀ শিখনফল: ৮

- | | |
|--|---|
| ক. স্বত্ববিলোপ নীতি কে প্রবর্তন করেন। | ১ |
| খ. ফরায়েজি আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? | ২ |
| গ. আব্দুল ছাত্তারের মহাস্থানগড় মাজার দেখে কোন সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ে যায়? উক্ত সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা কর। | ৩ |
| ঘ. উক্ত বিদ্রোহের ফলাফল মূল্যায়ন কর। | ৪ |

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক স্বত্ববিলোপ নীতি প্রবর্তন করেন লর্ড ডালহৌসি।

খ হাজি শরীয়তুল্লাহ বাংলা তথা ভারতবর্ষে প্রচলিত মুসলিম রীতিনীতিকে কোরআন এবং হাদিস এর আলোকে বিশুদ্ধতা দান করার জন্য যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন ইতিহাসে তাই ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত।

ফরায়েজি কথাটি ‘ফরজ’ শব্দ থেকে এসেছে। ইসলামে ‘ফরজ’ শব্দটির অর্থ অবশ্য কর্তব্য। মূলত ‘ফরজ’ শব্দ থেকেই ফরায়েজি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছে। হাজি শরীয়তুল্লাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে লক্ষ করেন যে, মুসলিম সমাজে এমন কিছু আচার-বিশ্বাস প্রবেশ করেছে যা ইসলামের মূল চেতনার পরিপন্থি। এজন্য তিনি কোরআন ও হাদিসের আলোকে বিশুদ্ধতা দানের জন্যই এ আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি পিরপূজা, কবর পূজা, জন্ম উৎসব, মহরমে শোক পালন প্রভৃতি বর্জন করার আহ্বান জানান।

গ আব্দুল ছাত্তারের মহাস্থানগড় মাজার দেখে ফকির-সন্ন্যাসীদের কথা মনে পড়ে যায়।

সুলতানি আমল থেকেই মাদারিয়া সুফি সম্প্রদায়ের ফকির এবং হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের জীবনাচার একই রকম ছিল। এরা মুক্ত ও স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করতো। মুষ্টি ভিক্ষার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। এরা সাথে হালকা অস্ত্র বহন করতো। ধর্মীয় উৎসব বা তীর্থস্থান পরিদর্শন উপলক্ষে তারা দলবদ্ধ ভ্রাম্যমান সংঘে বিভক্ত হয়ে সারাদেশের একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতো।

পলাশী যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ফকির-সন্ন্যাসীদের গতিবিধিতে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের তীর্থস্থান দর্শনের ওপর কর আরোপ করে। ভিক্ষা বা মুষ্টি সংগ্রহ করাকে বে-আইনি ঘোষণা করে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ডাকাত বা দস্যু হিসেবে ঘোষণা করে। এসব কারণে ফকির-সন্ন্যাসীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম শুরু করে। তাদের আক্রমণের লক্ষ ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাচারি এবং নায়েব গোমস্তাদের বাড়ি।

পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত কারণসমূহের প্রেক্ষিতে ফকির-সন্ন্যাসীরা বিদ্রোহ করেন।

ঘ উক্ত বিদ্রোহ তথা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক বিদ্রোহগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। ফকির-সন্ন্যাসীদের গতিবিধিতে বাধা, তীর্থস্থান দর্শনে করারোপ, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহ বে-আইনি এবং তাদেরকে ডাকাত বা দস্যু হিসেবে ঘোষণা করলে তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এ আন্দোলনে ফকিরদের নেতৃত্ব দেন ফকির মজনু শাহ এবং সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে একদল ফকির বাকেরগঞ্জ জেলার কোম্পানির ফ্যাক্টরি আক্রমণ করে দখল করে নেয়। একই বছর তারা রাজশাহীতে কোম্পানির ফ্যাক্টরিতে হানা দিয়ে ফ্যাক্টরি প্রধান মি. বেনেট কে বন্দি করে। বিহারের পাটনায় নিয়ে তাকে হত্যা করে। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ক্যান্টন ডি মেকেঞ্জির নেতৃত্বে ফকিরদের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী রংপুরে অভিযান প্রেরণ করলে এতে কিথসহ বহু ইংরেজ সৈনিক হতাহত হয়। ১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ফকির মজনু শাহ উত্তরবঙ্গে ইংরেজবিরোধী শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে মজনু শাহ তার দুই হাজার অনুসারীসহ রাজশাহীতে কোম্পানির অফিস আক্রমণ ও লুণ্ঠ করেন। পরের বছর অপর এক সংঘর্ষে সন্ন্যাসীদের হাতে ক্যান্টন টমাস পরাজিত ও নিহত হলে তাদের উৎসাহ আরো বৃদ্ধি পায়। ১৭৮৭ সালে মজনু শাহ মারা গেলে ফকিরদের নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ, সোবহান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ প্রমুখ। একই বছর ভবানী পাঠকের সন্ন্যাসী বাহিনীকে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য অতর্কিত আক্রমণ করে ভবানী পাঠক ও তার দুই সহযোগীকে হত্যা করে। এদিকে ইংরেজদের শক্তি ও ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। ব্যাপক ও নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইংরেজরা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ দমন করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, এ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ পরবর্তী ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ▶ ১৪ লালবাগ কেল্লা দেখে এক ছাত্র তার শিক্ষককে জিজ্ঞেস করল, এটি কেন নির্মাণ করা হয়েছিল। উত্তরে শিক্ষক বললেন যে, সামরিক কারণে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। মূলত: যুদ্ধের আক্রমণ প্রতিরোধে এবং সৈন্য ও গোলা-বারুদ নিরাপদে রাখতে কেল্লাটি ব্যবহৃত হতো। তবে বাংলার ইতিহাসে ব্রিটিশ ও জমিদার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতে ভিন্ন উপায়ে বিশেষ একটি কেল্লা নির্মাণ করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাংলার সকল প্রকার আন্দোলনে কেল্লাটির অনুপ্রেরণা রয়েছে। তাই বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে এটি বিশেষ গুরুত্ববহ।

◀ শিখনফল: ৮

- ক. অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন কে? ১
খ. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সামাজিক সংস্কারের জন্য বিখ্যাত কেন? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ কেল্লাটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন কেল্লার কথা মনে করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর তোমার পঠিত কেল্লাটি পরবর্তী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পথের দিশারী? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লর্ড ওয়েলেসলি অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন।
খ লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনক সামাজিক সংস্কারের জন্য বিখ্যাত। কেননা তার সংস্কারসমূহ গোটা সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছিল।

বেন্টিনক সদর নিজামত আদালতের জজদের সহায়তায় ১৮২৯ সালে ‘১৭নং রেগুলেশন আইন’ দ্বারা সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এই রেগুলেশন প্রথম বাংলায় চালু করা হয়। পরে ১৮৩০ সালে সারা ভারতবর্ষে কার্যকর করা হয়। এছাড়া তিনি তৎকালীন হিন্দু প্রথা অনুযায়ী প্রথম সন্তানকে গজা নদীতে নিক্ষেপ এবং কন্যা সন্তানকে গলাটিপে হত্যা করার নিয়মও রহিত করেন।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত বিশেষ কেল্লাটি আমার পাঠ্যবইয়ের সৈয়দ মীর নিসার আলী তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার কথা মনে করিয়ে দেয়।

উদ্দীপকে বর্ণিত ব্রিটিশ ও জমিদার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করতে কেল্লা নির্মাণ এবং পরবর্তীতে সকল আন্দোলনে কেল্লাটির অনুপ্রেরণা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মূলত তিতুমীর ব্রিটিশ শক্তিশালী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বিশ্বস্ত শিষ্য গোলাম মাসুম ও মিসকিন খাঁর পরিকল্পনায় নারকেল বাড়িয়ার গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। এটি তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা নামে পরিচিত। কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে একটি সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরণ করা হলে তিনি বাঁশের কেল্লার মাধ্যমে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা করেন। এ যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে জেনেও তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু ইংরেজদের গোলায় তোপের মুখে তার বাঁশের কেল্লা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। তবু বীরের মতো লড়াই করে তিনি বহু অনুচরসহ নিহত হন। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ধ্বংস হলেও তা যুগ যুগ ধরে বাঙালিদের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা ও প্রেরণা যুগিয়েছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি আমার পঠিত কেল্লাটি তথা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাটি পরবর্তী মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পথের দিশারী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে জমিদার, নীলকর ও শোষক শ্রেণির অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিতুমীর ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তিনি হিন্দু-মুসলিম সকল নিপীড়িত জনগণকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায়ের সংগ্রামে ঐক্যবন্ধ করে সামরিক শিক্ষা দেন। তিনি শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীকে মোকাবিলা করার জন্য নারকেলবাড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। যদিও শেষ পর্যন্ত কেল্লাটি ধ্বংস হয়েছিল তবুও এই কেল্লাটি পরবর্তী মানুষের সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তার বাঁশের কেল্লা নির্মাণের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, দৃঢ় মনোবল থাকলে সবকিছুই মোকাবিলা করা সম্ভব। ইংরেজদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংবলিত বাহিনীর কাছে তার বাঁশের কেল্লা নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। দেশপ্রেম ও দৃঢ় মনোবল থাকলে যে সকল বাধা দূর করা সম্ভব তিনি আমাদের তা শিখিয়েছে। তার আন্দোলন ব্যর্থ হলেও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের অত্যাচার, অবিচার বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম ছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। অন্যায় ও অত্যাচারীর সাথে আপোশহীন ভাবে সংগ্রাম করে জীবন বিসর্জন দিয়ে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা যুগে যুগে স্বাধীনতাকামীদের প্রেরণা দিয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাটি প্রকৃত অর্থেই মানুষের মুক্তি সংগ্রামের পথের দিশারী।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সম্প্রতি একটি দেশের সরকারি কর্মচারীরা তাদের সরকারের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের দাবি সরকার তাদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাছাড়া তারা দাবি করছে, ভিনদেশি এ সরকার নাকি তাদের ধর্ম নিয়েও তামাশা করছে। এসব কারণে কর্মচারীরা একজোট হয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। দেশের সাধারণ জনগণও তাদের এ আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে। তবে তাদের এ আন্দোলন সরকারের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী আর চতুরতাপূর্ণ কৌশলের কাছে কতটা সফল হবে বিশ্লেষকরা সেটা নিয়ে চিন্তিত।

◀ শিখনফল: ৯

- ক. ইতিহাসে বর্তমান যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীগণ কী নামে পরিচিত ছিল? ১
খ. টিপু সুলতানের কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২
গ. উল্লিখিত দেশটির সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনের সাথে এ উপমহাদেশের কোন আন্দোলনের সম্পৃক্ততা রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলনের ফলাফল বর্ণনাসহ ঐ সংগ্রামের ব্যর্থতা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইতিহাসে বর্তমান যুক্ত প্রদেশের অধিবাসীগণ রোহিলা আফগান নামে পরিচিত ছিল।

খ ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করতে যারা আমৃত্যু যুদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে টিপু সুলতান অন্যতম।

তিনি ছিলেন মহান যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা। তার ব্যক্তিগত পাঠাগারে ধর্ম, ইতিহাস, রণনীতি, চিকিৎসা ও গণিতের অনেক গ্রন্থ ছিল। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক মানুষ। নিজ রাজ্যে তিনি আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন। ফলে রাজ্যটি ব্যবসায়-বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে।

গ উল্লিখিত দেশটির সরকারি কর্মচারীদের সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সাথে উপমহাদেশের সিপাহি বিদ্রোহের মিল পাওয়া যায়। কোম্পানির শাসনামলে সিপাহিদের বেতন-ভাতা কম দেওয়া হতো। অল্প বেতনে তাদেরকে সুদূর আফগানিস্তান ও ব্রহ্মদেশে পাঠানো হতো। এসবের বিরুদ্ধে সিপাহিদের মনে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে এমন সময়ে ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে এনফিল্ড নামে এক প্রকার বন্দুক ব্যবহারের প্রচলন হয়। উক্ত বন্দুকে ব্যবহৃত কার্তুজ ছিল তৈলাক্ত। এ কার্তুজ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে বন্দুকে ভরতে হতো। এদিকে গুজব রটে যে উক্ত কার্তুজ গরু ও শূকরের চর্বি দ্বারা তৈরি। এই গুজবে ভারতবাসী সিপাহিগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

এ ছাড়া ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের কূটচালে মুসলমানগণ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং চাকরি হারিয়ে নিঃস্ব ও সম্বলহীন হয়ে পড়ে। এতে মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ব্রিটিশদের স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা হিন্দু জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হলে তারাও ব্রিটিশদের প্রতি রুষ্ট হয়। তাই উপমহাদেশের সমগ্র হিন্দু মুসলমান সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছিল।

ঘ উক্ত আন্দোলন অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও এর ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী।

এটি ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে। এ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট দ্বারা ভারতীয়দের জন্যে সরকারি উচ্চপদ সংরক্ষিত হয়।



সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

► উত্তর সংকেতসহ প্রশ্ন

প্রশ্ন ► ১৬ জনাব বোরহান একজন উপজেলা চেয়ারম্যান। তিনি তার এলাকায় অনেক প্রচলিত রীতি নীতির পরিবর্তন সাধন করেন। বিশেষ করে স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর চিতায় একত্রে অথবা বিদেশে কোনো নারীর স্বামীর মৃত্যু হলে তাদের স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার যে প্রচলন ছিল তিনি তা বিলোপ সাধন করে এলাকায় প্রসিন্ধি লাভ করেন। এ ছাড়াও তার এলাকায় এক শ্রেণির দস্যু ছিল যারা ছদ্মবেশে মানুষের সাথে চলাফেরা করত আর সুযোগ বুঝে মানুষের সর্বস্ব লুট করত। তিনি তাদেরও কঠোর হস্তে দমন করেছিলেন।

◀ শিখনফল-৬

- ক. গুর্খা রেজিমেন্ট-এর গঠনকারী কে? ১
- খ. উড়িষ্যার পাইক বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। ২
- গ. বোরহান সাহেবের প্রথম কাজটি পাঠ্যপুস্তকের যে সংস্কারের সাথে মিল রয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর উদ্দীপকের কাজগুলোর মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশের একজন লর্ড স্মরণীয় হয়ে আছেন? মতামতের সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক লর্ড ডালহৌসি গুর্খা রেজিমেন্টের গঠনকারী।

খ উড়িষ্যার খুরদা রাজ্যের সেনাপতি বিদ্যাধর মহাপাত্রের নেতৃত্বে যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তাই পাইক বিদ্রোহ নামে পরিচিত।

পাইকারবিদ্রোহীরা বাহারামপুরের পুলিশ ঘাঁটি ও সরকারি কার্যালয়গুলোর ওপর আক্রমণ চালায় এবং প্রায় একশ ইংরেজকে হত্যা করে। তাছাড়া তারা শহরের যাবতীয় সরকারি ঘর-বাড়ি

সবচেয়ে বড় সাফল্য এই যে, এ সংগ্রাম ছিল দেশপ্রেম ও প্রগতিশীলতার পরিচায়ক।

ঐতিহাসিক বিশ্লেষকগণ ১৮৫৭ সালের সংগ্রামকে মহাবিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন। তারা এ সংগ্রামকে ব্যর্থ হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো—

প্রথমত, ভারতের এ স্বাধীনতা সংগ্রাম সুসংগঠিত ছিল না। নেতৃত্ব ছিল বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল। ফলে বিদ্রোহ শক্তিশালী রূপ নিতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, সিপাহিদের রণকৌশল জানা থাকলেও ব্রিটিশ সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। অপরপক্ষে ব্রিটিশ বাহিনীর সমর রসদ ছিল পর্যাপ্ত।

তৃতীয়ত, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে সাংগঠনিক দুর্বলতা ও খবরা-খবর দেওয়ার অভাব দেখা দেয়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সিপাহি বিদ্রোহের নেতাগণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খবরা-খবর রাখতে ও যোগাযোগ করতে পারেননি। ফলে সংঘবন্দ আক্রমণ ও সহযোগিতার অভাব ঘটে।

চতুর্থত, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো দেশীয় রাজাগণ স্থানীয় জমিদার ও ভারতীয় বিশ্বাসঘাতকদের সিপাহি বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র এবং সিপাহিদের সাহায্য না করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা।

জ্বালিয়ে দেয় ও সরকারি খাজাঞ্চিখানা লুট করে। এমতাবস্থায় সরকারি কর্মচারীরা পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করে। কিছুদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় উড়িষ্যা থেকে ইংরেজ শাসন।



সুপার টিপস: প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের উত্তরের জন্যে অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তরটি জানা থাকতে হবে—

গ সতীদাহ প্রথা বর্ণনা করো।

ঘ লর্ড বেন্টিংকের সংস্কার কাজ আলোচনা করো।

প্রশ্ন ► ১৭ মিথিলার দাদু বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে তার নাতনিদের সাথে গল্প করছিলেন। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা কঠিন আত্মত্যাগের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাহসী সৈনিকরা ইতিহাসের একজন বিখ্যাত বীর যোদ্ধার কঠিন আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছে প্রতিনিয়ত। তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বাঙালি শহিদ হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

◀ শিখনফল-৮

- ক. ইজা-মারাঠা যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? ১
- খ. লর্ড ওয়েলেসলির কৃষি সংস্কারের অবদান আলোচনা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে দাদু ইতিহাসের কোন যোদ্ধার প্রতি ইজিাত করেছেন? উক্ত যোদ্ধার আন্দোলনের সবচেয়ে বিখ্যাত দিক সম্পর্কে আলোচনা করো। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে উক্ত ব্যক্তি কীভাবে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে তা বিশ্লেষণ করো। ৪